ফল্গু-ধারা।

(উপন্যাস)

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

৪৪, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভূদেব প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউস হইতে শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৪৪, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বুধোদয় প্রেস হইতে
শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পূজনীয়া
শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী
করকমলেষু

ভাই মেজদিদি!
প্রথম বইখানি লিখে
আমি উৎসাহ পেয়েছিলাম,
তোমার কাছেই বেশী, তাই
আজ আন্তরিক শ্রদ্ধা ও
কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ
আমার এই "ফল্গু-
ধারা" তোমাকেই
অর্পণ
করিলাম।

স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী—

ফল্গু-ধারা।

এক

হাতের কলম হাতে রহিয়াছে, 'নিবের' কালি শুকাইয়া গিয়াছে, সম্মুখে টেবিলের উপর, খোলা খাতা খানা একটী সদ্য লিখিত কবিতার কয়েক ছত্র বক্ষে ধারণ করিয়া অনাদরে পড়িয়া আছে, কিন্তু লেখকের সেদিকে মন বা দৃষ্টি কিছুই ছিল না।

সুদূর দিগন্তে, যেখানে ভোরের জমাট বাঁধা ধূসর কুয়াসা জাল ক্রমশঃ হাল্‌কা তরল হইয়া ছোট বড় গিরি চূড়াগুলি আষাঢ়ের ঘনায়মান মেঘস্তূপের মত ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল, শূন্য উদাস দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া পুলক তখন তন্ময় চিত্তে কি জানি কি ভাবিতেছিল।

তাহার সেই জট পাকানো এলো মেলো চিন্তা জাল ছিন্ন করিয়া দিয়া ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চা নিয়ে আসব হুজুর?"

সুদূর নিবদ্ধ উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি চকিতে ফিরাইয়া পুলক বলিল, "চা?—রসো এখন—আচ্ছা, নিয়েই এস।"

ভৃত্য চা রাখিয়া গেল। চা পান করিতে করিতে পুলক

নিজের মনেই বলিতে লাগিল—"না! আজকের সমস্ত সকালটা দেখছি মাঠে মারা গেল! ছোট একটা কবিতা তাও শেষ হ'ল না! কি জানি এক একদিন মাথায় কি খেয়াল চেপে বসে, লেখাতেও মন দিতে পারি না।"

তাহার পর শূন্য পেয়ালাটা এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া, রুমালে মুখ মুছিয়া পুলক পুনরায় লিখিবার জন্য সোজা হইয়া বসিল।

কিন্তু কলমটা হাতে তুলিতেই ভৃত্য ডাকের চিঠি পত্র লইয়া আসিল। একখানি মাসিকপত্র, একখানি সাপ্তাহিক, একখানি কোন প্রকাশকের প্রেরিত পোষ্টকার্ড, আর একখানি ফিকে নীল রংয়ের বাহারে খামে বন্ধ চিঠি।

সেগুলি টেবিলে রাখিয়া দিয়া চায়ের শূন্য পেয়ালা তুলিয়া লইয়া ভৃত্য চলিয়া গেল।

সেই নীল রংয়ের চৌকা খাম খানাই প্রথমে পুলকের চিত্ত আকৃষ্ট করিল, সে তাড়াতাড়ি সেখানা তুলিয়া লইল। উপরকার পরিচিত পরিস্কার হস্তাক্ষরে লিখিত শিরোনামায় দৃষ্টি পড়িতেই তাহার মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

—"আরে! এ যে মলয়ের চিঠি দেখ্‌ছি! এদ্দিন পরে বুঝি ছেলের চিঠি দেবার হুঁস হ'ল! আজকাল ভারি ব্যস্ত কি না!" আপন মনে মুচ্‌কি হাসিয়া সে পরম আগ্রহে চিঠি খানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কয়েক ছত্র পাঠ করিতে না করিতে পুলকের ঠোঁটের হাসি মিলাইয়া গেল। হর্ষপ্রদীপ্ত

মুখখানি কি এক মর্ম্মান্তিক বেদনার আঘাতে নিমেষে ম্লান বিবর্ণ হইয়া উঠিল। এ সংবাদ দুঃসংবাদ না সুসংবাদ ?

পত্রখানি আসিয়াছিল তাঁহার আবাল্য সুহৃদ, পরম বন্ধু মলয়ের নিকট হইতে, সে লিখিয়াছে—

"পুলক, ভাই !

আজ আমার বড় সুখের, বড় আনন্দের দিন !—আমার জীবনের এতদিনের কল্পিত সুখ স্বপ্ন, আমার যৌবনের একাগ্র সাধনা আজ সফল হইয়াছে।

সুন্দরী যূথিকা,—আমার মনোহারিণী, হৃদয় রাণী যূথিকাকে 'আমার' বলিবার অধিকার এবার সত্যই আমি পাইয়াছি। আজ পাকা দেখা হইয়া গেল, আগামী সপ্তাহে বিবাহ।

কিন্তু তুমি কি সে সময় আসিবে না ? প্রিয়তম সুহৃদ আমার ! —প্রাণের বন্ধু আমার !—তখন তুমি এসো !—নিশ্চয় এসো।

বিপুল অসম্বরণীয় পুলকোচ্ছ্বাসে হৃদয় আমার কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে !—এ আনন্দের ভাগ তোমাকে না দিয়া আমি যে কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিব না, ভাই ! আমার জীবনের সার্থকতা ও সৌভাগ্যে মণ্ডিত, আনন্দময় শুভ মুহূর্ত্তটীতে তোমাকে কাছে না পাইলে সমস্ত আমোদ উৎসব যে আমার বিস্বাদ হইয়া যাইবে ভাই !—তুমি এসো—একবার নিশ্চয় এসো !—"

এমনি আরও কত হর্ষোচ্ছাস ও স্নেহপ্রীতি ভরা অনুনয় বচনে পত্রখানি পরিপূর্ণ।

চিঠি পড়া শেষ হইলে বরষার সজল অন্ধকার মেঘের ভিতর ক্ষণিক বিজলী রেখার মত পুলকের ব্যথাভরা বিমর্ষ মুখখানিতে একটুখানি চকিত হাসি খেলিয়া গেল।

সে আপনা আপনি বলিয়া উঠিল "বারে! এ মন্দ নয়!" তাহার পর চিঠিখানা অবজ্ঞাভরে টেবিলের একধারে ছুড়িয়া ফেলিয়া বুকের উপর দুইবাহু সংবদ্ধ করিয়া চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়া পুলক পুনরায় ভাবিতে বসিল।

যে অচিরাগত বিপত্তির ভয়ে সে তাহার দেশ, ঘর, দ্বার সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর মত এই স্বজন বান্ধবহীন সুদূর নিভৃত পার্ব্বত্য প্রদেশে গোপনে পলাইয়া আসিয়াছে, সেই বিপত্তির মুখে ধরা দিবার জন্য—নিজের হৃৎপিণ্ড নিজের হাতে ছিঁড়িয়া, ব্যর্থ জীবনের সমস্ত আশা ও আনন্দের অন্তিম সমাধি, স্বচক্ষে হাসিমুখে দাঁড়াইয়া দেখিবার জন্য, এখানে এতদূরেও বন্ধুর এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, এই স্নেহ ভরা সাদর আহ্বান আসিয়া পঁহুছিয়াছে!

হায়রে অদৃষ্ট!—নিষ্করুণ ভাগ্য দেবতার একি নিষ্ঠুর নির্ম্মম পরিহাস! আঃ! ধন্যবাদ বন্ধু! ধন্যবাদ!

চিন্তার অতল তলে তলাইয়া গিয়া আত্মহারা পুলক তখন অতীতের পথে অনেকখানি পিছাইয়া গেল।

মনে পড়িল প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে তাহার প্রিয় বন্ধু মলয় যখন চিরদিনের লাজুক স্বভাব পুলককে যূথিকাদের গৃহে এক প্রকার টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, যেদিন অনিন্দ্য সুন্দরী

তরুণী যূথিকা তাহার অনবদ্য অতুলনীয় রূপলাবণ্য লইয়া, নির্ম্মল শারদাকাশের অঝোরে ঝরিয়া পড়া শুভ্র অনাবিল জ্যোৎস্না ধারার মত মূর্ত্তিমতী মধুর কবিতা ছন্দের মত, তাহার নবোন্মেষিত যৌবনের মদির স্বপ্ন মুগ্ধ তৃষিত দৃষ্টির সম্মুখে প্রথম আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—

সেদিন পুলকের মনে হইয়াছিল যেন তাহার নিভৃত অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের কল্পনা গঠিত মানসী প্রতিমা খানি আজ শরীরিণী হইয়া প্রত্যক্ষ দেখা দিতে আসিয়াছে!

সেই দিন, সেই মুহূর্ত্তে—শুভ কি অশুভ ক্ষণে বলা যায় না, পুলকের সৌন্দর্য্য বিমুগ্ধ তরুণ চিত্তখানি ভক্ত উপাসকের মত সেই রূপময়ী দেবী প্রতিমা চরণ তলে অজ্ঞাতে লুটাইয়া পড়িল।

—সেদিন যে পুলকের চিরস্মরণীয়!

—সেই অবধি—দিনে দিনে পলে পলে সে তাহার জীবনের প্রত্যেক অণু পরমাণু দিয়া, দেহের প্রত্যেক শোণিত কণা দিয়া, হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দন দিয়া, মনের সমগ্র অনুভূতি ও একাগ্রতা দিয়া— কুমারী যূথিকাকে কি গভীর ভাবেই ভালবাসিয়াছে!

তাহার পর, নিভৃত অন্তরকোণে গোপনে একটা দুরাশা পোষণ করিয়া সে যখন মনে মনে কল্পনার স্বর্গরাজ্য গড়িয়া তুলিতেছিল,—ঠিক সেই সময়—একদিন কেমন অতর্কিতে, কি নিষ্ঠুর ভাবেই তাহার সেই ভুলটুকু ভাঙ্গিয়া গেল!

পুলকের তখন মনে হইয়াছিল, সেই ভুলভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে, যেন তাহার হৃদয় খানিও ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল!

সেদিন ছিল যূথিকার জন্মতিথি। যূথিকা ধনী কন্যা না হইলেও তাহার মাতা একমাত্র দুহিতার জন্মতিথি উপলক্ষে বেশ একটু সমারোহ করিয়াছিলেন।

বন্ধুর সহিত পুলকও নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। বাঞ্ছিত প্রিয় পাত্রীর জন্মদিনে উপহার দিবার জন্য পুলক নিজের পছন্দ মত একটী দামী জড়োয়া ব্রুচ, এবং তাহার নূতন প্রকাশিত 'মানসী' কাব্য একখানি সঙ্গে আনিয়াছিল।

পরিষ্কার ঝক্ ঝকে বাঁধাই করা বই খানির সুদৃশ্য উপহার পৃষ্ঠায় পুলকের সুন্দর হস্তাক্ষরে কুমারী যূথিকার নাম এবং দুই ছত্র মধুর কবিতা লেখা।

কবিতাটীর প্রত্যেক শব্দে যেন দাতার শ্রদ্ধানত প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সেই সুন্দর মনোরম সামগ্রী দুইটী উপহার রূপে লাভ করিয়া যূথিকার সুন্দর মুখখানি আনন্দের হাসিতে ভরিয়া গেল। শত মুখে অজস্র প্রশংসাবাদ করিয়া সে উপহার দাতার পানে স্মিত প্রফুল্ল নয়নে চাহিয়া মলয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ্‌লে?—পুলক বাবুর কেমন চমৎকার পছন্দ!—তা হবে না? কবি মানুষ যে উনি।"

বন্ধুর প্রশংসায় পুলকিত হইয়া মলয় প্রসন্ন মুখে বলিল, "শুধু কবি নয়, যূথী! এই বন্ধুটী আমার বাস্তবিক অসাধারণ! কোনও দিকেই বাদ যান না!—কবিতায়, গানে, গল্পে, উপন্যাসে, একেবারে সকল দিকেই সমান!"

কিন্তু ঠিক তাহার পরক্ষণেই যখন মলয় তাহার আনীত উপহার দ্রব্য বাহির করিল, শুধু একগাছি অল্প মূল্যের গিনি সোণার সরু চেনহার মাত্র, তখন সেইটুকু পাইয়া যূথিকার মৌন স্মিত মুখে উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও নিবিড় অনুরাগের যে প্রগাঢ় লালিমা সদ্যস্ফুট গোলাপের রক্তিম রাগের মত ফুটিয়া উঠিল, দর্পণের মত স্বচ্ছ শান্ত চক্ষু দুটীতে যে এক আকস্মিক অভিনব ভাবের উচ্ছ্বাস চকিতে খেলিয়া গেল, তাহা পুলকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না।

যূথিকা কোমল মৃদু মধুর হাসিয়া, মলয়ের দিকে অনুরাগ ভরা বঙ্কিম কটাক্ষে চাহিয়া সেই হার ছড়াটী তখনই গলায় পরিয়াছিল! সে দৃশ্য যেন আজও পুলকের চক্ষে তরুণ সজীবতায় জাগিয়া আছে!

সেদিন, কেহ কিছু মুখ ফুটিয়া না বলিলেও মলয় ও যূথিকার হাব ভাব কথা বার্ত্তা সমস্তই যেন পুলকের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল তাহারা পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ। সেখানে পুলকের কিছু মাত্র আশা নাই!

নৈরাশ্যে পূর্ণ হইয়া তখন পুলকের ব্যথাতুর হতাশ চিত্ত হায়! হায়! করিয়া উঠিল—ওরে হতভাগা!—বৃথা,—বৃথা তোর এই দুরাশা!

তাহার পর সরল প্রাণ মলয়, আবার যেদিন উচ্ছ্বসিত আনন্দের সহিত, বন্ধুর নিকট তাহাদের দুজনের প্রগাঢ় অনুরক্তি, এবং শীঘ্রই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার ইচ্ছা

স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করিয়া ফেলিল,—সেই দিনই পুলকের হঠাৎ পাহাড় দেখিবার বাসনা অদম্য হইয়া উঠিল।—সেই অবধি পুলক গৃহত্যাগী, প্রবাসী।

সে প্রায় চারি মাসের কথা। এই দীর্ঘকাল সুদূর নৈনিতাল শৈলে, সে নির্ব্বাসিত বিরহী যক্ষের মতই নিঃসঙ্গ নিভৃত জীবন যাপন করিতেছে, কিন্তু ইহাতেই কি নিস্তার আছে!

আজি আবার এই নিদারুণ শুভ সংবাদ অযাচিতে দিয়া তাহার সুখ-আশাহীন ব্যথিত জীবনের এই বিজন শান্তিটুকু ভাঙ্গিয়া দিবার কি প্রয়োজন ছিল?

ভাগ্য বিড়ম্বিতকে আবার নূতন করিয়া এই মর্ম্মান্তিক আঘাত না দিলেই ত ভাল হইত!

এ যে মরার উপর খাঁড়ার আঘাত! বন্ধুর সেই সাদর নিমন্ত্রণ পত্রখানা নিষ্ফল আক্রোশে কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পুলক "ওঃ! যূথিকা!—যূথিকা!—তোমাকে মনে মনে "আমার" বলিবার অধিকারটুকুও এত দিনে হারাইলাম!" বলিতে বলিতে একটী সুগভীর বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া শরাহত পক্ষীর মত চেয়ার খানার উপর লুটাইয়া পড়িল।

তখন বেশ একটু বেলা হইয়াছে। তরুণ সূর্য্যালোকে ম্লান-মুখী প্রকৃতির সেই বিষণ্ণ ঝাপ্‌সা ভাবটুকু নিঃশেষে কাটিয়া গিয়াছে।

নিশীথ রাতের পথহারা শুভ্র বাদল শিশুগুলি,—যাহারা

রজনীর অন্ধকারে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া এতক্ষণ নিভৃত গভীর পর্ব্বত কন্দরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, 'প্রভাতের বিকশিত উজ্জ্বল অরুণ-কিরণে জাগিয়া উঠিয়া. তাহারা এখন যে যাহার পথ চিনিয়া লইয়া পরম উল্লাসে পালভরা তরণীর মত মৃদু মন্থর গমনে আকাশ পানে ভাসিয়া চলিয়াছে।

কতক্ষণে আহত মূর্চ্ছাতুর মনখানিকে সচেতন সংযত করিয়া পুলক আবার উঠিয়া বসিল।

বন্ধুর পত্রের উত্তর দিবার অভিপ্রায়ে সে টেবিলের উপর হইতে চিঠি লেখার প্যাড্‌খানা টানিয়া লইল।

কিন্তু কি লিখিবে ? এতো সাদর নিমন্ত্রণ নহে, মর্ম্মবিদারী কঠোর নিষ্ঠুর বিদ্রূপ !

তাহার বড় ইচ্ছা হইতেছিল বন্ধুর এই প্রীতিপূর্ণ সাগ্রহ আহ্বান নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিষ্ঠুর ভাষায় খুব বড় বড় অক্ষরে শুধু এই কথা কয়টী লিখিয়া দেয়—

—বন্ধু হইয়া বন্ধুর সহিত এত বড় শত্রুতা কেন সাধিলে মলয় ? তোমাদের পরিপূর্ণ মিলনোৎসবের অবাধ অবসর দিয়া যে ভাগ্যহীন এত দূরে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসনে চলিয়া আসিয়াছে, সেই নিরানন্দ ব্যথিত বঞ্চিতকে তোমাদের এই সুখময় আনন্দ-মিলন-গীতি শুনাইয়া, ব্যথার উপর আরো ব্যথা নাই বা দিতে বন্ধু !'

'বন্ধুর জীবনের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াও কি তোমার আশ মিটে নাই ?

কিন্তু তখনই মনে পড়িল তাহার প্রিয়তম বন্ধুর সেই হর্ষোজ্জ্বল প্রীতি বিকসিত স্নেহময় মুখচ্ছবি—আর সেই যূথিকা? —এই অভীপ্সিত মিলনে সেও আন্তরিক সুখী হইয়াছে নিশ্চয়, —কিন্তু সে?

হায়রে অভাগা! তাহার এই গূঢ় গোপন মর্ম্মবেদনার জন্য সে আজ কাহাকে দায়ী করিবে? কাহার দোষ দিবে?

সে ত তাহার অন্তর্নিহিত সুগভীর প্রচ্ছন্ন অনুরাগের আভাস মাত্রও কোনও দিন কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ হইতে দেয় নাই,—তবে?

দুর্ব্বল অবশচিত্তে শক্তি সঞ্চয় করিয়া পুলক তখন প্যাঁডের কাগজের উপর ক্ষিপ্রহস্তে লেখনী চালনা করিয়া লিখিতে লাগিল—

"মলয়! অভিন্ন হৃদয় বন্ধু আমার!

কোনও অনিবার্য্য কারণে বাধ্য হইয়া আমি তোমাদের আনন্দময় শুভ মিলনোৎসবে যোগদান করিতে পারিলাম না, —তুমি বন্ধুর এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা কর।

তোমাদের বাঞ্ছিত মিলন সুখ চির দিন অব্যাহত অক্ষুণ্ণ হউক, —সুখের পিয়াসী তরুণ জীবন দুটী বিমল প্রেমানন্দে ভরপুর সার্থক হউক,—পরিপূর্ণ গৌরবে সম্পদে ভবিষ্যত তোমাদের উজ্জ্বল হউক, —সুমধুর স্নিগ্ধ 'মলয়' পরশে সুন্দর যূথিকা কলিটী প্রস্ফুট বিকশিত হউক—সুদূর প্রবাস হইতে এই কামনা, এই প্রার্থনাই করিতেছি বন্ধু! আমার কাছে তুমি ইহার চেয়ে বেশী আর কিছুর প্রত্যাশা করিও না।—এই আমার মিনতি।"

দুই

পুলক বসু ও মলয় দত্ত, বাল্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু। দুইজনেই প্রায় সমবয়স্ক। তাহাদের বাসস্থান চুঁচুড়ায় ; এক সঙ্গে স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তাহারা এক সঙ্গেই কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুনাম ও সুখ্যাতির সহিত বি-এ পাশের ডিগ্রী অর্জ্জন করিয়াছে। উভয়েই অবস্থাপন্ন। উভয়ের সাংসারিক অবস্থাও প্রায় একইরূপ ছিল।

মলয়ের সংসারে একটী অনূঢ়া ভগিনী ও প্রবীনা পিসীমা আছেন মাত্র।

পুলকের তাহাও নাই। সংসারে সে একা। পুলকের পুত্রগতপ্রাণ পিতা একমাত্র মাতৃহীন আদরের সন্তানটীর সংসার যাত্রার জন্য যথেষ্ট পাথেয় রাখিয়া নিশ্চিন্তে চক্ষু বুজিয়াছেন, সেও প্রায় দুই বৎসরের কথা।

আর সকল বিষয় মিলিলেও এই বন্ধু দুটীর প্রকৃতিগত বিলক্ষণ পার্থক্য দেখা যাইত।

মলয় ছিল সুশ্রী সুন্দর সদালাপী, আমোদপ্রিয়, রঙ্গ চঞ্চল তেজস্বী যুবক, আর পুলক আকৃতিতে বন্ধুর সমতুল্য হইলেও প্রকৃতি ছিল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত—সে ছিল অল্পভাষী, চিন্তাশীল, বিনয়ী, ধীর, গম্ভীর প্রকৃতির লোক।

কিন্তু সেজন্য এই বিভিন্ন স্বভাবের বন্ধু দুইটীর মধ্যে অকপট প্রীতি ও সৌহার্দ্দের অভাব ছিল না।

মলয় বি-এ পাশ করিয়া একটা বড় কাজের জন্য চেষ্টা করিতেছে।

পুলক চঞ্চলা কমলার অচঞ্চল করুণাটুকু অযাচিতে লাভ করিয়া তাহার নিরবচ্ছিন্ন নিশ্চিন্ত অবসর দেবী বীণাপাণির সেবায় নিয়োজিত করিয়াছে।

তাহার একাগ্র সাধনার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই পুলক সাহিত্য জগতে একজন সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

তখনকার নামজাদা ও প্রধান পত্রিকাগুলিতে এই তরুণ লেখকের রচনা ত থাকিতই, তদ্‌ভিন্ন কয়েকখানি উপন্যাস ও একখানি কাব্য গ্রন্থও সে ইহারই মধ্যে ছাপাইয়া ফেলিয়াছে। কুমারী যূথিকার সহিত পরিচিত হইবার পর দুই বন্ধুর সেই সম্প্রীতির ভাব এ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু এই অপ্রিয় বিবাহ ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ দেখিবার মত সাহস বা ধৈর্য্য যূথিকার নীরব উপাসক পুলকের ছিল না, তাই সে নিজে না গিয়া দূর হইতে বিবাহের মূল্যবান উপঢৌকন সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়া বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীকে তাহাদের সুখ ও সৌভাগ্যের জন্য অভিনন্দিত করিল।

দুই মাস পরে পুলকের কাছে আবার সংবাদ আসিল মলয় সুদূর বর্ম্মা দেশে একটা বড় রকম কাজ পাইয়াছে, এবং নব পরিণীতাকে লইয়া সেই দেশে রওয়ানা হইয়াছে।

একটা দুঃখের ও স্বস্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়া পুলক দীর্ঘকাল পরে প্রবাস হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

তাহার আরাধনার ধন যূথিকা আজ আরো দূর দূরান্তরে চলিয়া গিয়াছে,—কিন্তু তাহাতেই বা পুলকের ক্ষতি কি ?

এই দূরত্ব—এই ব্যবধান পুলককে একটা নূতন আঘাত দিলেও সে যেন এতদিন মনে মনে এই কামনাই করিতেছিল।

ধ্যানের বস্তু দূরে বা নিকটে থাক, একই কথা। বরং ধ্যেয় বস্তু কাছে থাকিলে ধ্যানের ব্যাঘাত হয়।

তাই পুলক তাহার ধ্যানের দেবীর পবিত্র স্মৃতিমন্দির অন্তরের গোপনতম প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আবার নূতন উদ্যমে, অনলস অক্লান্ত ভাবে সাহিত্য সাধনায় মগ্ন হইয়া পড়িল।

কবির কবিতায় এবার নূতন সুর বাজিল। তাহার প্রত্যেক ছত্রে, ছন্দে, বন্দে, শব্দে, সুরে, কত যুগযুগান্তরের সঞ্চিত বিরহ বেদনা যেন করুণ বিষাদ রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

গল্পে, উপন্যাসে নৈরাশ্য ও ব্যর্থতায় ভরা কল্পিত প্রেমের করুণ চিত্রগুলি, যেন মর্ম্মান্তিক মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়া পাঠকের চক্ষের কোণে সমব্যথার অশ্রুজল ফুটাইয়া তুলিল।

এইরূপে পুলক তাহার নিরলম্ব ব্যর্থ জীবনকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করিল।

তিন

বেচারা পুলকের কিন্তু ইহাতেও নিষ্কৃতি নাই। পুলক দেশে ফিরিয়াছে, সংবাদ পাইবা মাত্র মলয় তাহার অভিভাবকহীন ভগিনীর ও সংসারের তত্ত্বাবধান করিবার ভার অসঙ্কোচে বন্ধুর স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছে।

বন্ধুর অনুরোধ উপেক্ষা করা পুলকের মত বন্ধুবৎসলের পক্ষে অসম্ভব।

তাই তাহার অনবসর সাহিত্য চর্চ্চার মধ্যেও বন্ধুগৃহে দুটী বেলা হাজিরা দিয়া আসিতে সে কুণ্ঠিত বা বিরক্ত হইত না। কিন্তু তাহাতেই কি পরিত্রাণ আছে ছাই!

একদিন আবার হঠাৎ মলয়ের নিকট হইতে আর একটী অনুরোধ আসিয়া তাহাকে বিস্মিত ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল।

মলয় অনুনয় করিয়া লিখিয়াছে—

"ভাই পুলক!

তুমি জানো বোধ হয় পিসীমা কাশীবাস করিবার জন্য কি রকম ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, কিন্তু লিলির একটা ব্যবস্থা না করে তো তিনি কোথাও নড়িতে পারেন না, তাই তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ করিবার জন্য আমাকে ক্রমাগত তাগিদের উপর তাগিদ দিয়া অস্থির করে তুলেছেন।

কিন্তু এই নির্ব্বান্ধব অপরিচিত দূর দেশে আমি লিলির

উপযুক্ত সুপাত্র পাব কোথায় বল? পিসীমা সেটা তো বুঝেন না!

পুলক, ভাই! তুমি আমার জন্য অনেক করেছ; এখন একটু চেষ্টা চরিত্র করে যদি লিলির জন্য একটী সুপাত্রের সন্ধান করিতে পারো, তবেই আমি একটা বিষম চিন্তা ও দায়মুক্ত হই। আর,—আর বলিতে সাহস হয় না ভাই! আমার ছোট বোন্‌টীকে যদি তুমি নিজেই গ্রহণ কর, তা হয় নাকি পুলক?

আমি জানি, লিলি রূপে গুণে কিছুতেই তোমার সমযোগ্য নয়, কিন্তু আমাদের আশৈশব বন্ধুত্বের জোরে, অন্যায় হইলেও তোমার উপর এই দাবীটুকু আমি করিতে পারি না কি ভাই?

তোমার উপর জোর জুলুম করার আরও এক কারণ আছে, তুমি জানো না বোধ হয়, লিলি সেই ছোটবেলা হইতে তোমাকে ভালবাসে। সেজন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস অন্য কোথাও বিবাহ দিলে সে সুখী হইতে পারিবে না। বন্ধুর এ অনুরোধ তুমি কি রাখিবে না ভাই?"

এ আবার কি নূতন উপদ্রব! হায়! মলয়! মলয় হতভাগ্য পুলক তোমার কাছে এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যে পদে পদে তাহাকে লাঞ্ছিত পীড়িত করিয়াও তোমার আশ মিটিতেছে না?

তোমাকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া, সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সে যে শুধু তাহার আরাধ্যা দেবীর স্মৃতির পূজায় জীবন মন সমর্পণ করিয়াছে, তাহাতেও বাধা দিতে চাও? সর্ব্বহারা রিক্ত

জীবনের এই পরম ও চরম সুখ, এই অন্তিম সম্বলটুকু কাড়িয়া না লইলে বুঝি তোমার তৃপ্তি হইবে না বন্ধু ?

রাগ করিয়া পুলক আর সেদিন মলয়দের বাড়ী গেল না।

কিন্তু বৈকালে যখন পিসীমাতা তাহাকে নিজেই ডাকিয়া পাঠাইলেন সে একবার না গিয়া থাকিতে পারিল না।

প্রথমেই দেখা হইল মলয়ের বোন লীলার সহিত। লীলা তখন তাহাদের গাড়ীবারান্দায় একাকিনী দাঁড়াইয়া থামের-গায়ে জড়ানো পুষ্পিত গোলাপ-লতার এক গুচ্ছ ফুল তুলিয়া লইয়া তাহার কচি পাপড়ীগুলি অন্যমনে নখ-দিয়া ছিঁড়িতেছিল।

তাহার প্রতীক্ষমান চক্ষুদুটী ছিল 'গেটের' দিকে, সম্ভবতঃ সে এতক্ষণ পুলকেরই আশাপথ চাহিয়াছিল। লীলা মেয়েটী সুন্দরী না হইলেও দেখিতে শুনিতে মন্দ ছিল না। তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে বেশ একটু লালিত্য,—স্বাস্থ্য পুষ্ট সুকুমার অঙ্গ সৌষ্ঠবে একটা কোমল কমনীয়তা ও মধুর শ্রী ছিল।

পরণে একখানি লেশ পাড় দেওয়া ফিকে আসমানি রংয়ের সাড়ী, সেই রংয়েরই ব্লাউস। আলগা করিয়া বাঁধা শিথিল কবরীতে গুটীকত রজনী-গন্ধা। কণ্ঠের সরু হার ছড়াটী, হাতের পালিস করা চক্‌চকে চুড়ী কয়গাছি, কাণের চুণীর দুল দুটী, 'কণে দেখা' বেলার আরক্ত আভায় ঝিক্ মিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

পুলককে দেখিয়াই সে উৎফুল্ল স্মিতমুখে আগ্রহের সহিত বলিল, "এসেছেন ! ওবেলা যে বড় আসেন নি ?"

কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটীর কোমল মুখে একটুখানি সলজ্জ মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু পুলকের সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না, তাহার মনটা আজ বড়ই অপ্রসন্ন ও বিরক্ত ছিল। লীলার হাসিভরা মুখখানির দিকে না চাহিয়াই সে অন্যমনে উত্তর দিল, "ওবেলা একটা জরুরী কাজ ছিল, তাই আসতে পারিনি, পিসীমা কোথায় ?"

লীলা ঔদাস্তের সহিত বলিল, "জানি না, আমি তো অনেকক্ষণ ওধারে যাইনি,আর ভাল লাগে না আমার—" পুলক এতক্ষণে লীলার মুখের পানে দৃষ্টি তুলিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাল লাগে না লিলি ?—পিসীমার বকুনি ?"

লিলি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "না না; পিসীমার বকুনি আজকাল ঢের কমে গিয়েছে, একলা আমাকেই আর কাহাঁ তক বক্‌বেন ?"

"তবে কি ভাল লাগে না' বলছিলে ?"

"এই বাড়ী,—সত্যি, দাদা গিয়ে পর্য্যন্ত যেন বাড়ীখানা অনবরত খাঁ খাঁ করছে, থাক্‌তেই ইচ্ছে করে না।"

প্রবাসী ভ্রাতার জন্য ভগিনীর এই ব্যাকুলতাটুকু পুলকের অন্তর স্পর্শ করিল।

এমনি একটী স্নেহময়ী ভগিনী যদি তাহারও থাকিত! সংসারে সে একা, নিতান্তই একা,—তাহার জন্য ভাবিবার, তাহার জন্য দরদ দেখাইবার আর যে কেহই নাই!

লিলিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কথাটা রহস্যচ্ছলে উড়াইয়া দিয়া পুলক সহাস্যে কহিল—

"তোমাকে এ বাড়ী ছাড়াবার ব্যবস্থা শীগ্‌গিরি কর্‌ছি লিলি, —আর বেশী দেরি নেই!"

লিলি তাহার বিস্ময়াকুল দৃষ্টি পুলকের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি রকম?"

পুলক মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার দাদা যে তোমার বিয়ের ঘটকালির ভার আমার ঘাড়েই চাপিয়েছেন, তা জানো না বুঝি?—বউকে নিয়ে সেখানে বসে বসে খালি হুকুম চালানো হচ্ছে।"

লিলি আর কিছু বলিল না, অস্বাভাবিক আরক্ত মুখে সে ক্ষিপ্র চরণে বাগানের দিকে চলিয়া গেল।

পুলক তখন পিসীমার সন্ধানে বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখিল তিনি ভিতর ঘরের দালানে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন।

কাছেই একখানা বেতের মোড়া রাখা ছিল, পুলককে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া তিনি বাকি জপটা তাড়াতাড়ি সারিয়া লইলেন। তাহার পর মালাটা মাথায় ঠেকাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া পিসীমা উপবিষ্ট পুলকের পানে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ বাবা? আজ ওবেলা এলে না, শরীর বেশ ভাল আছে তো?—চেহারাটা কেমন শুক্‌নো শুক্‌নো লাগছে না?"

পুলক সলজ্জ হাস্যে কহিল, "ভালই আছি পিসীমা, আজ

একটা বিশেষ দরকারি কাজ ছিল, তাই আসতে পারিনি। মলয়ের চিঠি পত্র পেয়েছেন পিসীমা ?"

"হ্যাঁ বাবা, তাইতো তোম্যকে ডেকে পাঠালুম।"

পুলকের বুকের ভিতর ধক্ করিয়া উঠিল এখানেও সেই বন্ধুত্বের দাবী নাকি ?—সে সভয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "মলয় কি লিখেছে পিসীমা ?"

পিসীমা কিছু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "কি আর লিখ্‌বে বাবা, —তা'র সেই বাঁধা গৎ—এখানে পাত্রের সন্ধান আমি কোথায় পাব ?—সে ভারও এবার তোমার ঘাড়েই চাপিয়েছে, বাবা, তুমিই যদি একটা কিছু বিহিত করো। ছেলের নিজের তো কোনও যোগ্যতা নেই, লিখেছেন আমি পুলককে লিখেছি, সে দেখে শুনে লিলির ভাল সম্বন্ধ করে দেবে।"

যাক্ ফাঁড়াটা কাটিয়া গেল ! শুধু বিবাহের সম্বন্ধ করা—আর কিছু নয় ! পুলক স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তার জন্য আর ভাবনা কি পিসীমা ? কল্‌কাতায় আমার ঢের জানাশোনা ঘর আছে, আমি শীগ্‌গির আপনার লিলির ভাল বর খুঁজে দেব।"

পিসীমা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "তা তুমি পারবে বাবা, তুমি আমাদের জন্যে কি না করেছ ? তোমার দয়ায় লিলি আমার যদি ভাল ঘরে পড়ে !—আহা দুর্ভাগা মেয়েটা, ওর বাপ মা বেঁচে থাক্‌লে আর ভাবনা কি ছিল বল ?—থাকবার মধ্যে ঐ একটা ভাই,—তা সেও বিয়ে করেই সাহেবদের মত সাত

তাড়াতাড়ি বউ নিয়ে চলে গেল !—এখনকার ছেলেদের সবই বাড়াবাড়ি কি না !”

পিসীমার কথার শেষাংশ শুনিয়া পুলকের হাসি আসিল। সে বলিল, “আচ্ছা পিসীমা ! লিলির বয়স তো তেমন হয়নি, তবে বিয়ের এত তাড়াতাড়ি করছ কেন ?”

পিসীমা বিস্ময়ে চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, “আবার কি বয়স হবে বাবা ? পনেরো পেরিয়ে ষোলোয় পড়ল—বিয়ে হলে যে এদ্দিন দুছেলের মা হ'ত !—তা বাবাজীর আমার সে সব দিকে খেয়াল তো নেই ! আমারই যত কর্ম্মভোগ আর কি ? তা তুমি একটু দেখো বাবা, মা বাপ খেগো মেয়েটা, খেয়ে পরে যাতে মনের সুখে থাকে, সেই চেষ্টাই করো। অবিশ্যি পয়সার জন্যে আটকাবে না, ওর বাপ যা রেখে গেছে—”

বাধা দিয়া পুলক বলিল, “আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন পিসীমা। লিলির খুব ভাল বিয়ে হবে।”

পিসীমা হৃষ্ট অন্তরে কহিলেন, “আহা ! তাই বল বাবা ! তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। লিলির একটা বিলি ব্যবস্থা হয়ে গেলেই আমি এখন নিশ্চিন্দি হয়ে কাশীবাস করতে পারি। নইলে এত বড় আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে তো কোনখানেই স্বোয়াস্তি নেই। ভাইপোটী তো স্বচ্ছন্দে আমার ঘাড়ে বোঝা দিয়ে চলে গেল, কিন্তু আমি এ ঘাড়ের বোঝা কোথায় ফেলি বল ?”

পুলক সায় দিয়া বলিল, "তা তো বটেই ! আচ্ছা তাহলে এখন আসি পিসীমা !"

পিসীমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ওমা এরি মধ্যে উঠলে বাবা ? একটু জল টল খেয়ে যাও, ও লিলি ! মেয়েটা গেল কোথায় ?"

পুলক শশব্যস্তে কহিল, "না পিসীমা ! কিছু দরকার নেই, আমি যে এইমাত্র চা খেয়ে এসেছি—"

কিন্তু পিসীমা ছাড়িবার পাত্রী নহেন, লিলির প্রত্যাশা না করিয়া তিনি নিজেই পুলকের জন্য একথালা জলখাবার সাজাইয়া আনিলেন। পুলক পিসীমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহার যত্ন-প্রস্তুত খাবারগুলির যথারীতি সদ্ব্যবহার করিল।

তাহার পর আরও খানিক গল্প গাছা করিয়া সে যখন পিসীমার কাছে বিদায় লইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঘরে ও বাহিরে বিজলীর বাতিগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

বাহিরের দিকে আসিতেই পুলকের বোধ হইল, কে যেন খুস্ করিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল। "কেও, লিলি নাকি ? লিলি !" কিন্তু লিলি নামধারিণীর কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

পুলক একটু চিন্তান্বিতভাবে পূর্ব্বোক্ত গাড়ীবারান্দায় আসিতেই শুনিতে পাইল, "একবারটী শুনে যান।" পুলক চকিত হইয়া দেখিল লীলা প্রথমে যেখানটীতে দাঁড়াইয়াছিল

ঠিক সেইখানে গোলাপ লতার পাশে, আধ আলো আধ আঁধারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে।

একটু আশ্চর্য্য হইয়া পুলক বলিল, "ওদিকে অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে কেন লিলি? এদিকে এসো না।" কিন্তু লিলি নড়িল না, যেখানকার সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার এই অদ্ভুত ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া পুলক অগত্যা নিজেই তাহার কাছে এগাইয়া গিয়া বলিল, "আমাকে কিছু বলবে লিলি?" লীলা মাথা নাড়িয়া 'হাঁ' বলিল। পুলক বলিল, "কি বলতে চাও, তা আমায় স্বচ্ছন্দে বলতে পারো।"

লীলা মুখ নামাইয়া সঙ্কোচের সহিত বলিল, "আমি বলছিলুম কি,—আমার জন্যে আপনি ওসব কিছু করবেন না।"

পুলক কথাটার মানে ভাল বুঝিতে না পারিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি সব করব না লিলি?"

লীলা কুণ্ঠিতভাবে সলজ্জ মৃদু কণ্ঠে কহিল, "এই যে সম্বন্ধ টম্বন্ধের কথা কি সব বলছিলেন এখনি।"

এতক্ষণে ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া পুলক হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "ওহো বুঝেছি! এতক্ষণ আড়িপেতে সব শোনা হয়েছে? তা সম্বন্ধ টম্বন্ধ না করলে বিয়ে হবে কি করে বলতো?"

মুখখানা আরও নীচু করিয়া বাম হাতের চুড়ীগুলি ডান হাত দিয়া নাড়িতে নাড়িতে লীলা অবজ্ঞার সহিত বলিল, "না ই বা হ'ল বিয়ে!"

লীলার কথা ও ভাবভঙ্গীতে পুলক কিছু শঙ্কিত সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল, "বেশ! বিয়ে না হলে কি করবে তুমি?"

"যেমন আছি এমনি থাকব।"

"কিন্তু তোমার পিসীমা যে কাশীবাস করবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন—তোমার বিয়ে না হলে—"

"পিসীমা কাশীবাস করুন না গিয়ে—আমি তো বারণ করছি না?"

"তা হলে তুমি একা কোথায় থাকবে?"

"এইখানেই।"

"আচ্ছা পাগল যাহোক্! কিন্তু তোমার দাদা যে এতকরে আমায়—"

লীলা এবার ঝঙ্কার তুলিয়া রাগের সহিত বলিল, "আমার বিয়ের জন্যে দাদার এত মাথা ব্যথা কিসের? তিনি বিয়ে করেছেন বলেই কি পৃথিবী সুদ্ধুকে বিয়ে করতে হবে? —আমি বিয়ে কক্ষণো করবো না তা বলে দিচ্ছি।"

লীলার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা তাহার কথাগুলি যে মিথ্যা নহে সত্য, তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত করিতেছিল।

পুলক সচকিতে ভাবিল তবে মলয়ের কথাই কি সত্য? লিলি কি তাহাকে বাস্তবিক ভালবাসে?—তাই কি অন্যত্র বিবাহে তাহার এই আপত্তি?

সে একটু দুঃখিত ও গম্ভীর হইয়া কহিল, "এটা তোমার ভুল ধারণা লিলি,—আমি তোমার জন্যে খুব ভাল পাত্র—"

বাধা দিয়া লীলা রাগ ও অভিমানের সুরে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা আপদে পড়েছি !—ভালমন্দর কথা কে বলছে আপনাকে ? আমি বিয়ে করব না, করতে পারব না, ব্যস্ ! এক কথা বলে দিলুম !"

"কেন বিয়ে করবে না, লিলি ?"

"আমার ইচ্ছে !"

"কিন্তু এমন অন্যায় ইচ্ছে হলে তো চলবে না—"

লীলা বিরক্তি ভরে কহিল, "অন্যায়টা হ'ল কিসে শুনি ?—এই তো আপনিও এত বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে থাওয়া করেন নি,—তাতে কিছু অন্যায় হয় নি ?—আর আমার বেলাতেই বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে ?"

পুলক হাসিয়া বলিল, "আমি যে পুরুষ, লিলি ! তাছাড়া আমার বিয়ে না করবার একটা বিশেষ কারণও আছে।"

"স্ত্রীলোকের কি 'কারণ' থাকতে নেই ?"

পুলক হার মানিয়া বলিল, "তা তোমার 'কারণ'টা কি তা আমি শুনতে পাই না কি ?"

"কিচ্ছু দরকার নেই শুনে —"

লীলা পাশ কাটাইয়া ড্রয়িংরুমের দিকে চলিয়া যাইতেছিল, পুলক বাধা দিয়া বলিল, "তোমার দাদার চিঠি একখানা আজ আমার কাছেও এসেছে, সেখানা তোমাকেও দেখান উচিত মনে করি।"

লীলা অনাগ্রহের ভাবে চিঠিখানা গ্রহণ করিয়া বলিল, "এখনি পড়তে হবে ? আচ্ছা তা হ'লে আপনি ঘরে

এসে বসুন একটু, চিঠিখানা আমার পড়া হলে নিয়ে যাবেন।”

পুলক সম্মত হইল। ড্রয়িংরুমে গিয়া আলোর কাছে লীলা চিঠিখানি একান্তে পড়িতে লাগিল।

পুলক অদূরে বসিয়া সংশয়ে স্পন্দিত বক্ষ, অপলক নেত্রে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাঠিকার মুখ ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিল।

লিলি পত্রখানি অবিলম্বে পাঠ করিয়া কম্পিত হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে আসিল। তাহার উত্তেজনারক্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া পুলক দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে সঙ্কোচের সহিত বলিল, “কথাটা কি সত্যি লিলি ? তোমার দাদা যা লিখেছেন।”

লীলা নিরুত্তরে অধোবদন হইয়া রহিল।

তাহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেও কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া জানিবার জন্য পুলক পুনরায় বলিল, “আমার কথাটার উত্তর দাও লিলি! অমন করে চুপটী করে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে তো চলবে না!”

কিন্তু লীলা তখনও নির্ব্বাক নীরব অধোমুখী! তবে আর সন্দেহ নাই, লীলা তাহাকে প্রকৃতই ভালবাসে। পুলকের জীবনের একমাত্র কামনার নিধি যূথিকার স্মৃতি যে এখনও তাহার সমগ্র হৃদয়খানি জুড়িয়া আছে, সেখানে অন্য নারীর স্থান কোথায়? সে কি আর এ জীবনে অন্য নারীকে ভালবাসিতে পারিবে? তবে এই সরলা বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে দুঃখের ভাগী করিবে কেন?

পুলক ব্যথিত হইয়া ক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, "কিন্তু তুমি আমার মনের ভাব জানো না লিলি! বিবাহ হয়তো আমি এ জীবনে করব না, আর করলেও তা'তে সুখী হ'তে পারব না।"

লিলি এতক্ষণে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পুলকের পানে চাহিল, পুলক সবিস্ময়ে দেখিল লীলার রঙ্গ চপল সুন্দর চক্ষু দুটী অশ্রুর আভাসে চক্ চক্ করিতেছে। মনে একটা আঘাত পাইয়া পুলক অতিমাত্র ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "আমার সংকল্প কি জানো লীলা? অবিবাহিত থেকে চিরজীবন সাহিত্য সেবা করব—"

লীলার এবার মুখ ফুটিল, সে ম্লানভাবে মৃদু হাসিয়া কহিল, "পৃথিবী শুদ্ধ লেখকেরা সবাই চিরকুমার থাকেন বুঝি?" তাহার কথার সুরে অভিমান ভরা!

পুলক একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, তা তো থাকেন না, কিন্তু থাকাই বোধ হয় উচিত। বিয়ে হ'লে সংসারের ঝঞ্ঝাটে মানুষ এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে, যে ইচ্ছে থাক্‌লেও তা'রা আর কোনও কাজই ভাল করে করতে পারে না।"

লীলা আর কিছু বলিল না, তাহার আনত বদনে আশা-ভঙ্গ জনিত ব্যথার আভাস স্পষ্ট জাগিয়া উঠিল। খানিকক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পুলক মিনতিভরা সস্নেহ কণ্ঠে কহিল, "ওসব খেয়ালে তুমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও, লিলি—লক্ষ্মীটী! তুমি নেহাত ছেলে মানুষ এখনো ভাল মন্দ বিচার করবার বয়স তোমার

হয় নি। কিন্তু আমি তোমার শুভাকাঙ্খী, দেখে শুনে আমি তোমাকে যা'র হাতে দেব, সে আমার চেয়ে ভালই হবে।"

লীলাকে তখনও নীরব দেখিয়া মৌনং সম্মতি লক্ষণং—ভাবিয়া পুলক হৃষ্টচিত্তে বলিল, "আচ্ছা তা' হ'লে এখন চল্লুম লিলি,—কাল একবার কল্‌কাতায় যেতে হবে, সেজন্যে হয়তো ক'ল আর এখানে আসতে পারবো না।"

দ্বারাভিমুখে কয়েকপদ অগ্রসর হইতেই কিসের একটা শব্দ শুনিয়া পুলক চমকিয়া দাঁড়াইল, দেখিল একখানা ইজিচেয়ারে শ্রান্তভাবে বসিয়া পড়িয়া লীলা দুটী হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগ রোধ করিতে প্রয়াস পাইতেছে।

অন্তরে ব্যথা পাইয়া পুলক লীলার কাছে ফিরিয়া আসিল। দুঃখিত ক্ষুব্ধ স্বরে সে কহিল, "একি তুমি কাঁদছ লিলি?—ছি! ছি! আমাকে কেন এমন ক'রে অপরাধী কর লিলি?—তুমি তো জান না, আমি কতখানি নিরুপায়।" কিন্তু লীলার কান্না বন্ধ হইল না। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পুলক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কিন্তু আমার মত ছন্নছাড়া লোকের সঙ্গে বিয়ে হ'লে তুমি কি বাস্তবিক সুখী হ'তে পারবে লিলি?—স্ত্রী স্বামীর কাছে যা চায়,—যতখানি আশা করে, তোমাকে আমি হয়তো ঠিক ততখানি দিয়ে উঠতে পারব না, তা সত্বেও কি তুমি আমাকে—" লীলা মুখ তুলিয়া হাতের উল্টাপিঠ দিয়া আরক্ত চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ঘাড় নাড়িয়া ইসারায় জানাইল—তা সত্বেও সে পুলককে বরণ করিতে রাজি আছে

পুলক এবার মহা সমস্যায় পড়িয়া গেল। লীলাকে শান্ত করিবার জন্য সে প্রবোধ দিয়া বলিল, "আচ্ছা,—আজকের রাত্তিরটা আমাকে ভাববার সময় দাও, আর তুমিও বেশ করে ভেবে চিন্তে কাজ করো লিলি! যা'তে শেষকালে না অনুতাপ করতে হয়। বিয়ে তো ছেলে খেলা নয়, জীবন মরণের সমস্যা।"

পুলক সেদিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া তাহার এখনকার কর্ত্তব্য ভাবিতে লাগিল। সে এখন কি করিবে?

যূথিকা পুলকের হৃদয়ের উপাস্যা দেবা। যূথিকা, যে তাহার একনিষ্ঠ ভক্ত উপাসকের উন্মেষিত তরুণ যৌবনের বিকসিত প্রেমের অর্ঘ্য নির্ম্মম নিষ্ঠুরের মত চরণে দলিত করিয়া চিরদিন চির জন্মের তরে দূরে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, সেই কি সুখ, পাষাণ প্রতিমার স্মৃতিমাত্র ধ্যান করিয়া সে কি সারাজীবন অনায়াসে কাটাইয়া দিতে পারিবে?

এইতো সবে জীবন যাত্রার আরম্ভ, এখনো কত দীর্ঘ পথ পড়িয়া আছে,—কে জানে?

কিন্তু না না, তাহার প্রেমময় হৃদয় মন্দির যে এখনও সেই যূথিকার অমলিনস্মৃতির সৌরভে পরিপূর্ণ, সেখানে আর কাহাকেও প্রবেশাধিকার সে ত প্রাণ থাকিতে দিতে পারিবে না!

আবার মনে পড়িল লিলির কথা। আহা! সরলা বালিকা! ভাল মন্দ, না বুঝিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভালবাসা—সে অপাত্রে ন্যস্ত করিয়াছে। পুলক একজনকে ভালবাসিয়াছে,

ভালবাসার মর্ম্ম সে বিলক্ষণ বুঝে, এখন যদি এ বিবাহে সে অসম্মত হয়, তাহা হইলে পুলকের প্রত্যাখ্যান বালিকা লীলাকে কতখানি আঘাত করিবে, মনে করিতেই তাহার কোমল চিত্ত ব্যথায় ভরিয়া উঠিল।

আর যদি বিবাহ করে তাহা হইলেও কি পুলক তাহার পরিণীতাকে অকপট স্নেহ, যথার্থ ভালবাসা দান করিতে পারিবে? না অসম্ভব। তাহার প্রেম অনুরাগ, একজনকে সবই নিঃশেষে দান করিয়া সে যে একেবারে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে! তবে?

কিন্তু পুলক ত ইহজীবনে আর সুখী হইবার আশা রাখে না। তবে যদি তাহার দ্বারা আর একটী প্রাণী সুখী হয়, বিশেষতঃ সে তাহার পরম সুহৃদ মলয়ের সহোদরা—অন্য কেহ নয়, তখন বিবাহ করিলে এমন ক্ষতিই বা কি? তবু ত তাহার নিঃসঙ্গ জীবনে একটী সুখ দুঃখের সাথী পাইবে।

চার

ভবিষ্যতের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া পুলক অনিচ্ছায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইল।

লীলাকে পুলকের গৃহলক্ষ্মী করিয়া দিয়া পিসীমাতা প্রফুল্ল চিত্তে বিশ্বনাথের চরণাশ্রয়ে গমন করিলেন।

মলয় অবসর অভাবে এ বিবাহে আসিতে পারে নাই, দূর হইতেই নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ এবং ভগিনীপতি পুলককে তাহার আনন্দোদ্বেলিত প্রাণের গাঢ় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে।

বিবাহের পর পুলক তাহার ভাঙ্গা মন জোড়া দিয়া নূতন উদ্যমে তরুণী বধূটীর দিকে মনোনিবেশ করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। ক্রমাগত নিষ্ফল ব্যর্থ চেষ্টায় সে শীঘ্রই ক্লান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

এখন লিলির জন্য সে তাহার সাহিত্য চর্চ্চার দীর্ঘ অবসর কতক সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গটুকু সে কিছুতেই অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারিত না।

তবে পত্নীর সুখ স্বচ্ছন্দের দিকে পুলকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। লীলাকে সে নিজের সম্মুখে যত্ন করিয়া খাওয়াইত,—নিত্য নূতন বস্ত্রালঙ্কার দিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা পাইত।

কিন্তু স্বামীর এই অযাচিত যত্ন মমতা অপর্য্যাপ্তরূপে লাভ করিয়া লীলা যতখানি সুখী ও তৃপ্ত হওয়া উচিত তাহা হইতে

পারিল না। তাহার মনে হইত যেন তাহাদের বিবাহিত জীবনে কোথায় একটু অপূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে, অথচ সে অভাবটা যে কিসের সরলা অল্পবুদ্ধি লীলা তাহা ঠিক ধরিতে পারিতেছিল না।

মলয় বিবাহের পর যে অল্প কয়েকদিন সস্ত্রীক গৃহে বাস করিয়াছিল, সেই সুযোগে নবদম্পতীর দাম্পত্য প্রেমের মধুর চিত্র লীলা ভাল করিয়াই দেখিয়াছিল, তাহার নিজের পরিণীত জীবনের সহিত সে চিত্র যে কিছুই মিলে না!

মলয় নববধূর সঙ্গসুখ লাভ করিবার জন্য কেমন সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল উৎসুক হইয়া থাকিত, যেটুকু সময় বধূর স্নান আহার ও সাজ সজ্জায় অপব্যয় হইত, সেই সময় টুকুও যেন মলয়ের পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িত। তখন লুকাইয়া লুকাইয়া কেবলই এদিক ওদিক হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া সে লীলার কাছে মিষ্ট ভৎ'সনা ও উপহাস লাভ করিত। সেজন্য পিসীমাও সময় সময় বিরক্ত হইয়া বলিয়া ফেলিতেন, "আজকালকার ছেলেগুলো কি বেহায়া বাপু! একটু যদি লজ্জা সমীহ থাকে!"

মিলনের আগ্রহ ও ব্যাকুলতাটুকু লীলা যেন তাহার দাদার দিক হইতেই বেশী দেখিতে পাইত।

কিন্তু তাহাদের? তাহাদের অবস্থা যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পুলক তাহার স্ত্রীর সান্নিধ্য যে বিশেষ পছন্দ করে না, পাশ কাটাইয়া অধিকাংশ সময় তাহার লেখাপড়া করিবার

ঘরটীতে নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসে, তাহা লীলার অগোচর ছিল না।

নবদম্পতীর পরম আকাঙ্ক্ষিত মধ্যাহ্নের নিভৃত অবসর-টুকু পুলকের প্রায় লাইব্রেরী ঘরেই কাটিত। সে সময় লীলা সেখানে আপনা হইতে গেলে পুলক প্রকাশ্যে বারণ করিত না, কিন্তু সে যে মনে মনে সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহা স্বামীর মুখ দেখিয়াই লীলা বুঝিতে পারিত।

গভীর রাত্রে লেখাপড়া সাঙ্গ করিয়া পুলক যখন শয়ন কক্ষে আসিত, তখন লীলা প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়িত। যে দিন জোর করিয়া জাগিয়া থাকিত, সেদিন পুলককে যেন দায়ে পড়িয়াই পত্নীর সহিত খানিক স্নেহালাপ করিতে হইত, তাহার পর রাত জাগিলে শরীর খারাপ হইবে এই উপদেশ দিয়া সে লীলাকে অচিরে ঘুমাইতে বলিয়া নিজেও শুইয়া পড়িত।

তাহাদের দাম্পত্য জীবনের প্রথম অঙ্ক এই ভাবেই কাটিতেছিল।

স্বামীর এই নির্লিপ্ত নিরাগ্রহ ভাবে লীলা প্রথমটা কিছু আশ্চর্য্য ও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, তবে স্বামী কি তাহাকে একটুও ভালবাসেন না?

কিন্তু তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? স্বামীর অকপট স্নেহের পরিচয় সে ত বিবাহ হইয়া পর্য্যন্তই বহুদিক হইতে কত রকমে পাইয়া আসিতেছে। তাহাকে

যত্ন আদর স্নেহ দিতে তো স্বামী কোনও দিন কিছু মাত্র কার্পণ্য করেন নাই।

লীলা দেখিত, তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য স্বামী পুলকের সতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বদা কিরূপ সজাগ হইয়া থাকে, লীলাকে সামান্য বিষণ্ণ দেখিলে সে কতখানি ব্যস্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। একদিন লীলার সামান্য জ্বর হইয়াছিল, পুলক তাহার সেই সামান্য অসুখেই কিরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, এবং পত্নীর নিষেধ উপরোধ সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া সারা রাত জাগিয়া সযত্নে তাহার সুশ্রূষা করিয়াছিল। এ সমস্ত ঘটনাই তো স্বামীর অন্তর্নিহিত গভীর ভালবাসার স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তবে সে কেমন করিয়া বলে পুলক তাহাকে ভালবাসে না?

কিন্তু তথাপি,—এ সকল সত্ত্বেও লীলার মনে একটা খুঁৎখুতুনি ও অতৃপ্তির ভাব আসে কেন? অনেক ভাবিয়া অনেক মাথা ঘামাইয়া শেষে লীলা তাহার প্রকৃত অভাবের কথা বুঝিতে পারিল। সে দেখিল স্বামীর কাছে সে আর সমস্তই পাইয়াছে, পায় নাই শুধু তাঁহার অন্তরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সেইটুকু পাইবার, জন্য লীলা দিন কতক বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা তাহার সফল হয় নাই। পুলকের অর্গলাবদ্ধ হৃদয় দুয়ার সে কিছুতেই মুক্ত করিতে পারিল না, শুধু ঘা দিয়াই ফিরিয়া আসিতে হইল।

পুলক বিবাহের পূর্ব্বেই লীলাকে জানাইয়া দিয়াছিল,

স্ত্রী স্বামীর কাছে যতখানি প্রত্যাশা রাখে, পুলক হয় তো তাহার পত্নীকে ততখানি দিতে পারিবে না, সুতরাং লীলা তাহার দৈন্য ও অভাবের কথা জানাইয়া স্বামীর কাছে কোনও অনুযোগ অভিযোগ করিতে পারিল না।

তাই স্বামীর মনের নাগাল না পাইলেও যতটুকু পাইয়াছে ততটুকুতেই বেচারি লীলাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

'কি জানি লেখক মানুষের স্বভাবই বোধ হয় এম্নি অনাসক্ত আর গম্ভীর হয়' এই মনে করিয়া লীলা সেদিক্‌কার হাল ছাড়িয়া দিয়া গৃহধর্ম্মে মনোভিনিবেশ করিল।

কর্ত্রীহীন সংসারে চাকর দাসীরা এতদিন বেশ নির্ব্বিবাদে আরামে নিদ্রা দিতেছিল, এখন লীলা তাহাদের সজাগ করিয়া তুলিল।

বাসভবনখানি আদ্যোপান্ত নূতন চূণ কাম ও রং করাইয়া, ঘরের আসবাব পত্র কিছু মেরামত, কিছু বা নূতন কিনিয়া, গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানটীর আগাগোড়া সংস্কার করাইয়া, তাহাতে আরও কতকগুলি নূতন ফল ফুলের চারা গাছ বসাইয়া, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাণ্ডার ও রান্নাঘর মনের মত সাজাইয়া গুছাইয়া লীলা গৃহিনী শূন্য সংসারে একটা নূতন সৌষ্ঠব ও অভিনব শ্রী ফুটাইয়া তুলিল।

দেখিয়া পুলক বাস্তবিকই বড় প্রীত হইল। সে লীলাকে আদর করিয়া বলিল, "আমার লক্ষ্মীছাড়া সংসারে এবার সত্যি সত্যিই যে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হ'ল লিলি।"

স্বামীর প্রশংসা ও আদরে দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া লীলা গৃহস্থালীর কাজে মাতিয়া উঠিল। তদ্ভিন্ন একজন শিক্ষয়িত্রীর কাছে সে নানা প্রকার সৌখীন শিল্পকার্য্য ও সেলাই শিখিতে আরম্ভ করিল। কেবল লেখা পড়ার দিক্‌টাই কিছু ফাঁক রহিয়া গেল। সেদিকে লীলার কোনও দিনই মনোযোগ ছিল না।

সংসার ধর্ম্মে উদাসীন আত্মভোলা স্বামীটীকে ইচ্ছামত সেবা যত্ন দিয়া লীলা মনে মনে প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। সেই ছিল তাহার জীবনের সব চেয়ে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ কার্য্য।

পুলক সুগৃহিনীর হস্তে তাহার সংসার ও নিজের ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্য সাধনায় মন দিল।

কিন্তু বিবাহের পর পুলকের রচনাতে বিস্তর পরিবর্ত্তন দেখা গেল। এখন মাসিক ও সাপ্তাহিকে তাহার গল্প ও কবিতার পরিবর্ত্তে বেশীর ভাগই নানা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে দেখা যাইত। উপন্যাসে রোমান্সের চিত্রগুলি আর পূর্ব্বের মত উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে না। সেজন্য লীলার একজন উপন্যাসানুরাগিনী সখী অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিল, "পুলক-বাবু বিয়ে করে এমন হয়ে গেলেন কেন ভাই? যে লোকটার লেখায় রোম্যান্স প্রাণ ছিল, সে এখন হঠাৎ এত বড় ঘোর দার্শনিক হয়ে উঠল কেমন করে? —নতুন বিয়ে করে কোথায় প্রাণে আরো রসের ফোয়ারা ছুটবে,—তা না একেবারে নীরস কঠোর দার্শনিক! এ যে বড় আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!"

লীলা হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, "কি জানি ভাই! হয়তো এটা সঙ্গদোষেই হয়েছে।"

কিন্তু সম্পাদক ও প্রকাশক মহলে পুলকের প্রতিষ্ঠা ও সম্মান দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। তাঁহাদের ফাই ফরমাস যোগাইতে গিয়া পুলক সাহিত্যের নেশায় একেবারে মসগুল হইয়া উঠিয়াছে। বাগ্‌দেবীর একনিষ্ঠ উপাসনা ভিন্ন তাহার জীবনে যেন আর কোনই উদ্দেশ্য ছিল না।

স্বামীর এই অসামান্য প্রতিভা ও কৃতিত্বে লীলা পরম আনন্দিতা হইলেও তাঁহার এই লেখা পড়ার ব্যাপার লইয়া এতটা তন্ময়তা সে আদৌ পছন্দ করিত না।

তাই সে স্বামীর উপর অভিমান করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রায়ই অনুযোগ করিত, "এতখানি বাড়াবাড়ি না'ই করলে বাপু, যাদের বই বিক্রী করে সংসার প্রতিপালন করতে হয় তাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু তোমার তো ভগবানের দয়ায় সে সব চিন্তা নাই, এত মাথা ঘামাবার তোমার দরকার কি?"

পত্নীর অনুযোগে পুলক হাসিয়া বলিত, "লোকে পয়সার জন্যেই বুঝি বই লেখে লিলি?—ও যে একটা মস্তবড় নেশা! পেট ভরবার জন্যে যেমন মানুষ আহার চায়, তেমনি মনেরও তো একটা খোরাক চাই?—"

এই মনের খোরাকের যে কেন দরকার, সরল প্রকৃতি লীলার তাহা কিছুতেই বোধগম্য হইত না।

তবু পুলক যখন তাহার পাঠাগারে নিজের লেখা পড়ার

মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকিত, তখন লালা এক এক সময় বোনার কাজ হাতে লইয়া ধীরে ধীরে সেখানে গিয়া বসিত, এবং স্বামীর ধ্যাননিরত মূর্ত্তিখানির দিকে চাহিয়া সে নীরবে ভাবিত ঐ শুষ্ক নীরস কাগজপত্রগুলায় তাহার স্বামী এমন কি অপরূপ মিষ্ট রসের সন্ধান পাইয়াছেন, যাহা লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা, প্রহরের পর প্রহর এমনি করিয়া নীরবে অক্লেশে কাটাইয়া দিতে পারেন?

কিন্তু এমনি ভাবে চুপচাপ একস্থানে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকা লীলার চঞ্চল স্বভাব বিরুদ্ধ;—তাই স্বামীর ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষায় না থাকিয়া সে শীঘ্রই আবার উঠিয়া যাইত। কখনও নিজের নির্জ্জন ঘরে গিয়া আলস্য ভরে শুইয়া পড়িত, আর কখনও বা ঝিয়ের দ্বারায় তাহাদের প্রতিবেশিনী অরুণের মাকে ডাকাইয়া রীতিমত গল্প ফাঁদিয়া বসিত।

এমনি করিয়া বৈচিত্রহীন নিশ্চিন্ত সুখের মধ্যে একটী বৎসর ঘুরিয়া গেল। ইতিমধ্যে যূথিকার জননীর মৃত্যু হইয়াছে। যূথিকার আর ভ্রাতা বা ভগিনী কেহই ছিল না, সেজন্য মাতার মৃত্যুর পর তাহার পিতৃগৃহের সহিত সম্পর্ক একেবারেই শেষ হইয়া গেল।

ভগিনীর বিবাহের পর মলয়, লীলা বা পুলক কাহাকেও পত্রাদি বড় একটা দিত না, কারণ পত্র লিখিতে তাহার চিরদিনই বড় আলস্য।

এখন একদিন মলয় তাহার একটী পুত্ররত্ন লাভের সংবাদ পত্রের দ্বারায় ভগিনী ও ভগিনীপতিকে জানাইল।

পাঁচ

লীলা এখন সন্তানের জননী। তিন মাস হইল একটী পদ্মকলির মত ফুট্‌ফুটে সুন্দর শিশুকন্যা লীলার ক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়াছে। এই শিশুটীকে কোলে লইয়া লীলার জীবনে যেটুকু অভাব ছিল সেটুকুও পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন আর তাহাকে গল্প করিবার লোক খুঁজিতে হয় না। এখন খুকীকে দুধ খাওয়াইয়া, নিত্য নূতন পোষাকে সাজাইয়া, তাহাকে নানা প্রকারে আদর সোহাগ করিয়া সময় যে কোথা হইতে কেমন করিয়া চলিয়া যায়, তাহা লীলা বুঝিতেই পারে না। শিশুটীকে লইয়া সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিতে হয়, সেজন্য স্বামী-সঙ্গ লাভের জন্যও তাহাকে আর তেমন উৎসুক হইতে দেখা যায় না।

কর্ত্তব্যের অনুরোধে পুলক নবকুমারীকে বাহ্যিক যত্ন ও মমতা প্রদর্শন করিলেও মেয়েটী প্রকৃত পক্ষে পিতার আন্তরিক স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

সেজন্য লীলা কন্যার দিকে স্বামীর মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিত।

সেদিন সান্ধ্য ভ্রমণের পর তাহারা যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন অন্যদিনের চেয়ে একটু দেরী হইয়া গিয়াছে। কাপড় ছাড়িয়া পুলক তাড়াতাড়ি তাহার লাইব্রেরী ঘরের দিকে

যাইতেছিল, মাঝপথে লীলা গ্রেপ্তার করিল। সামুনয়ে বলিল, "এখনি ও ঘরে ঢুকতে হবে না, খুকীটাকে একবার দেখবে চল না, সে এরি মধ্যে কেমন হাসতে, কত খেলা করতে শিখেছে! —মেয়েটা কিন্তু চট্‌পটে হবে খুব—"

খুকীর খেলা ও হাসি দেখিবার জন্য মনে কিছুমাত্র আগ্রহ না থাকিলেও পুলক স্ত্রীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অনিচ্ছায় তাহার অনুবর্ত্তী হইল।

খুকী তখন দোলনায় দুলিতে দুলিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সবুজ 'সেডে' ঢাকা স্নিগ্ধ বৈদ্যুতিক আলোটুকু বিচিত্র সাজে সুসজ্জিতা পুতুলের মত ছোট মেয়েটীর সুপ্তি-নিথর সুন্দরারক্ত কচি মুখখানিতে পড়িয়া যেন স্বপ্ন রাজ্যের পরীশিশুর মত মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল।

খুকীর ঝি প্রভু ও প্রভুপত্নীকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

খুকীকে ঘুমাইতে দেখিয়া লীলা একটু হতাশ হইয়া বলিল, "ওমা! এরি মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে!—তুমি এইখানেই বস না, একটু এক্ষুনি উঠল বলে—বেশীক্ষণ ঘুমনো তো ওর অভ্যেসই নেই।"

লীলার আগ্রহ দেখিয়া পুলক সেইখানে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। লীলা খুকীর খুব কাছেই কার্পেট মোড়া মেঝের উপর উপবেশন করিয়া প্রীতিপূর্ণ উৎফুল্ল নয়নে মেয়েটীর ঘুমন্ত কোমল মুখখানির পানে অনিমেষে চাহিয়া

রহিল। চাহিয়া চাহিয়া গর্ব্বে আনন্দে স্ফীত হইয়া তরুণী মাতা তাহার নবলব্ধ স্নেহের পুতলীটীর দিকে স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিল, "দেখেছ—খুকী আমাদের দিনের দিন কেমন সুন্দর হয়ে উঠ্‌ছে!—যেন মোমে গড়া পুতুলটী! জেগে থাক্‌লে ভাল করে দেখ্‌তে।—আচ্ছা, এর নাম কি রাখা হবে বল তো? ও যেমন সুন্দর, তেমনি একটা ভাল দেখে নাম রাখা চাই—"

কন্যার দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া পুলক অন্যমনে কহিল, "তা আমি কি করে বলব বল?—যে নাম তোমার পছন্দ, তাই রাখো না।"

"আর তোমার বুঝি কোনও পছন্দ অপছন্দ নেই? মাগো! কি যে বল তুমি! এত বড় একজন লেখক—"

স্ত্রীর কথায় হাসিয়া উঠিয়া পুলক বলিল, "লেখকদের বুঝি নাম নির্ব্বাচন করাই ব্যবসায়?—আসল কথাটা কি জানো লিলি! খুকী যদি খুকী না হয়ে খোকা হ'ত, তা'হলে ওর নামকরণটা আমিই করতুম, কিন্তু ও যে মেয়ে,—মেয়ের নামকরণ তা'র মা'রই করা উচিত। অন্ততঃ আমার মতে।"

লীলা স্বামীর এই অদ্ভুত ধারণায় গালে হাত দিয়া বলিল, "তোমার সকলি অনাসৃষ্টি! মেয়ে হ'লে যে তা'র নাম মা'কেই রাখতে হয়, এমন কথা তো কস্মিন কালেও শুনি নি!—আচ্ছা, খুকী যদি খোকা হ'ত,তো'হলে তুমি ওর নাম কি রাখতে শুনি?"

মৃদু হাসিয়া পুলক বলিল, "মলয়"।

লীলা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "ওমা! সেকি? ও যে দাদার নাম!"

"তা হ'লই বা, তোমার দাদার নাম তো অল্ রাইটস্ রিজার্ভড্ করা নয়!—যে ইচ্ছে সেই রাখতে পারে।"

লীলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা তো পারে জানি, কিন্তু মামার নামে ছেলের নাম কি করে হ'তে পারে?"

"কেন হতে পারে না? যে নাম আমার কাণে সব চেয়ে প্রিয়, সব চেয়ে মধুর লাগে—"

বাধা দিয়া লীলা সপরিহাসে কহিল, "সত্যি দাদাকে তুমি এখনো এত ভালবাস!—কিন্তু দাদার বোন্‌টীকে কেন দেখতে পারো না?"

পুলক একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "ঠাট্টা নয় লিলি! মলয় যে আমার কাছে কি বস্তু তা তুমি জানো না! জানো না যে শুধু তা'র বন্ধুত্বের অনুরোধেই আমি আমার—"মনের আকস্মিক উত্তেজনায় পুলকের মনের কথা প্রায় বাহির হইয়া পড়িতেছিল, তাড়াতাড়ি সাম্‌লাইয়া লইবার জন্য সে মাঝখানে থামিয়া পড়িল।

লীলা কথাটা অন্যভাবে লইয়া সকৌতুকে হাসিতে হাসিতে বলিল, "বল বল থাম্‌লে কেন? কেবল বন্ধুত্বের অনুরোধেই যে আমাকে গ্রহণ করেছ তা কি আমি জানি না? সব জানি গো! আমি সব জানি! বাস্তবিক তোমার এই ভালবাসা দেখে আমার দাদার ওপর ভারি হিংসে হয়!"

স্মিত কটাক্ষে পত্নীর দিকে চাহিয়া পুলক সহাস্যে কহিল, "তাই নাকি? তোমায় দাদাকে ভালবাসি তা'তেও তোমার হিংসে হয়?"

"তা হবে না!—আমার চেয়ে তুমি অপর কাউকে বেশী ভালবাসলে আমার সেটা গায়ে লাগবে না? তা সে 'দাদা' 'দিদি' যেই হ'ন না কেন!—আচ্ছা যাক্ ও কথা, তোমার ও ভালবাসার নাম তো খুকীর হ'তেই পারে না—তা'হলে কি নাম হবে? 'মলয়া' 'মলয়াবতী'—নাঃ—ওসব নাটুকে ধরণের নাম আমার ভাল লাগে না! আচ্ছা, এক কাজ কর্‌লে হয় না?"

"কি?"

"খুকীর নাম যদি 'যূথিকা' রাখি তা'হলে কেমন হয়?"

পুলক অকারণে চমকিয়া উঠিল। আজ তাহার স্ত্রী এমন সব কথা বলিতেছে কেন! সেকি স্বামীর অন্তরের প্রচ্ছন্ন গূঢ় রহস্যের আভাস পাইয়াছে নাকি?

স্বামীকে নীরব দেখিয়া লীলা পুনরায় বলিল, "কি বল? যূথিকা নামটী বেশ সুন্দর আর মোলায়েম, নয়? আমার তো ভারি পছন্দ।"

পুলক অনাগ্রহের ভাব দেখাইয়া বলিল, "বেশ তো, তোমার যদি পছন্দ হয় ঐ নামই রাখো। কিন্তু ও'যে খুকীর মামীর নাম—"

লীলা হাসিতে হাসিতে কহিল, "তা হ'লই বা; মামার নামে যদি ছেলের নাম রাখা চলে তা'হলে মামীর নামে মেয়ের নাম

রাখা চলবে না কেন? এ হবে ছোট্ট যুথিকা! বেশ তো যুঁই যুঁই বলে ডাকা যাবে।"

পুলক আর কিছু না বলিয়া খুকীর ঘুমন্ত মুখখানির দিকে অপলকে চাহিয়া রহিল, সেই সময় খুকী ঘুমের ঘোরে 'দেয়লা' করিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া একটু হাসিল, একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল, একটুখানি ফুপাইয়া নীরবে কাঁদিল, তাহার পর আবার অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল।

নিদ্রিত শিশুর সেই স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হাসিকান্নার অপরূপ রহস্য দেখিতে দেখিতে পুলক স্বগত বলিয়া উঠিল, "যুথিকা, যুথিকা! বাস্তবিক কি কোমল মধুর শব্দটুকু! মেয়েটী বড় হইয়া যদি যুথিকার মত হয়! তা হইতে পারে না কি? ঐ যে ছোট্ট মুখখানিতে তাহার একটুখানি 'আদল' আসে না? চক্ষু দুটী যেন তেমনি শান্ত, তেমনি নীল, স্বচ্ছ! আশ্চর্য্য কেমন করিয়া এমন মিল হইল! পুলকের মনে প্রাণে ধ্যানে অহরহ যে মধুর ছবিটী জাগিয়া আছে, তাহারই প্রতিচ্ছায়া বুঝি ঐ ছোট মেয়েটীতে আসিয়া পড়িয়াছে?

কি এক অভিনব পুলকাবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া সেই-দিন, প্রথম সেইদিন পুলক উদ্বেলিত গাঢ় স্নেহে খুকীর ফুলের মত কোমল ক্ষুদ্র মুখখানিতে গভীর আবেগে চুম্বন করিল।

তাহার পর পুলক নিত্যকার মত লাইব্রেরী ঘরে গেল বটে, কিন্তু লেখা, পড়া কিছুই হইল না। কিসের একটা অপূর্ব্ব

অনুভূতি ও প্রবল উচ্ছ্বাস প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠিয়া তাহার মনকে আলোড়িত বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল।

সেদিন যদি কেহ পুলকের ব্লটিং বহিখানা তুলিয়া দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত ছোট বড় অক্ষরে ক্রমাগত লেখা হইয়াছে—যুঁই—যূথিকা—শ্রীমতী যূথিকা—আমার যূথিকা—

ছয়

কিসে কি হইল বলা যায় না, কিন্তু সেইদিন সেই মুহূর্ত্ত হইতে পুলকের যেন আর এক নূতন জীবন আরম্ভ হইল। সেই ছোট্ট যুঁই, সেই ক্ষুদ্র অতিক্ষুদ্র প্রাণীটী যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিক মায়াবলে অমনোযোগী পিতাকে ক্রমাগত নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল। সেই প্রবল আকর্ষণ ক্রমে পুলকের জীবনের একমাত্র প্রিয় ও ধ্যেয় বস্তু সাহিত্য সাধনাতেও বিঘ্ন-প্রদান করিতে লাগিল।

এখন লিখিতে লিখিতে সেই ছোট্ট যুঁইর ছোট্ট কচি মুখখানি কতবার তাহার ভাব-নিমগ্ন ধ্যানরত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত বিমনস্ক করিয়া তুলে! পড়িতে পড়িতে সেই ক্ষুদ্র শিশুটীর মৃদু কান্নার মিষ্ট স্বরটুকু শুনিবার জন্য সে কতবার উৎসুক উৎকর্ণ হইয়া উঠে! এ যে কিসের মোহ, কিসের আকর্ষণ তাহা বুঝিতে না পারিলেও পুলক নিজের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া নিজেই অবাক্ হইয়া গেল।

নূতন মোহে আকৃষ্ট হইয়া পুলক এখন দিনের অধিকাংশ সময় তাহার শিশুকন্যার পাশে কাটাইতে আরম্ভ করিল।

মেয়েটী তা'র গোলাপের পাপড়ীর মত কচি রাঙ্গা ঠোঁট ফুলাইয়া কেমন অকারণে ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে!—নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল স্বচ্ছ চক্ষুদুটী মেলিয়া কেমন নিষ্পলক নীরব দৃষ্টিতে

তাহার পানে চাহিয়া থাকে! আবার সে উঠিয়া গেলে সেই দৃষ্টিটুকু কেমন ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারই গতির অনুসরণ করে! —ছোট ছোট হাত পা গুলি নাড়িয়া সে কেমন আপন মনে দুপ দাপ্ করিয়া খেলা করিতে থাকে!

মেয়েটীর এই হাসি, খেলা, কান্না, সমস্তই পুলককে কি এক অপূর্ব্ব বিচিত্র ভাবের প্রেরণায় আত্মহারা মুগ্ধ করিয়া তুলিল।

দিনের পর দিন যতই যাইতে লাগিল, সেই ছোট্ট যাদুকরী মেয়েটা তাহার নিত্য নূতন হাসি খেলা ও মধুমাখা অস্ফুট কাকলীর অচ্ছেদ্য মোহজাল বিস্তার করিয়া আরও দৃঢ় আরও নিবিড় ভাবে জড়াইয়া ধরিতেছিল।

যুঁইকে সে আর কাহারও কাছে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, তাহার মায়ের কাছেও নয়। কারণ পুলক তাহার সন্তানের জননী লীলার যতখানি পরিবর্ত্তন আশা করিয়াছিল, ঠিক ততখানি দেখিতে পাইল না। পুলকের মনের বিশ্বাস, লীলার নারীত্বের মধ্যে প্রকৃত মাতৃভাবের বিকাশ এখনও হইতে পারে নাই। কোথায় যেন একটুখানি কি ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে।

যদিও সন্তানের প্রতি লীলার যত্ন ও মনোযোগের অভাব পুলক কোনও দিন দেখে নাই—ঘড়ীর কাঁটা দেখিয়া মেয়েকে দুধ খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, কাপড় ছাড়ানো, স্নান করানো,—বেড়াইতে পাঠানো এ সমস্তই সে ঠিক সময় মত

করিতে পারে,—কিন্তু তাই বলিয়া মেয়েকে লইয়া অনবরত জড়াইয়া থাকাটা লীলা মোটেই পছন্দ করিত না।

একবারটী কোলে করিল, একটুখানি আদর করিল, একটু বা হাতে করিয়া নাচাইল,—ব্যস্,—যথেষ্ট! ইহার চেয়ে বেশী আদর আব্দার দিলে যে মেয়েকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে!

বিশেষতঃ তাহাদের অবস্থা যখন ভাল, মেয়ের জন্য দু দুজন দাসী আছে, তখন খামখা নিজেকে জড়াইয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? অন্ততঃ লীলার ইহাই বিশ্বাস ছিল।

কিন্তু পুলকের ভাবপ্রবণ মন যেন আরও কিছু চায়,—তাই সন্তানের প্রতি মাতার অবশ্য কর্ত্তব্যগুলি লীলা সমস্তই করিতেছে দেখিয়াও সে তেমন সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত হইতে পারিতেছিল না। লীলার বাৎসল্য স্নেহের মধ্যে মাতৃহৃদয়ের সে অপরিতৃপ্ত মমতার ক্ষুধা, সেই সদা হারাই হারাই ভাবের একাগ্র ব্যাকুলতাটুকু কোথায়?

সে আশায় নিরাশা হইয়া পুলক সন্তানের সে অভাবটুকু পূর্ণ করিতে নিজেই তাহার সমস্ত মন প্রাণ দিয়া লাগিয়া গেল। সে ভাবিল, লীলা আদর্শ স্ত্রী হইতে পারে,—কিন্তু আদর্শ জননী কখনই হইতে পারে না।

পিতার প্রাণ ঢালা ঐকান্তিক স্নেহাদরের মধ্যে ক্ষুদ্র যূথিকা বর্ষায় ধোয়া সুন্দর শুভ্র যুঁই ফুলটুকুর মতই দিন দিন অম্লান শোভায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল এবং জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রথমে পিতাকেই আপনার বলিয়া চিনিতে শিখিল।

কন্যার প্রতি স্বামীর এই অসাধারণ স্নেহাতিশয্য লীলাকে নিরতিশয় পুলকিত ও গর্ব্বিত করিয়া তুলিল। সে যখন তখন সকলের কাছে বড় গৌরব করিয়া বলিত, "এখন ঐ মেয়েটাই যেন ওঁর গলার হার হয়েছে!" মায়ের কোলে থাকিয়াও যুঁই যখন পিতার বুকে ঝাপাইয়া পড়িবার জন্য হাত পা ছুড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিত, তখন লীলা মনে মনে পরম পরিতৃপ্ত হইলেও বাহ্যিক ক্রোধের ভাণ দেখাইয়া বলিত, "দেখ্‌লে? মেয়েটা কি রকম বেইমান!—আমি যেন ওর কেউ নয়।"

যুঁই ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া বসিত, হামা দিতে ও অল্প হাটিতেও শিখিল। সে যখন অস্থির চরণে মাতালের মত টলিতে টলিতে পিতার কাছে 'বাব্বা!' বলিয়া ছুটিয়া আসিত, তখন পুলকের স্নেহের পিতৃহৃদয়খানি এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও মমতারসে সিঞ্চিত আর্দ্র হইয়া উঠিত।

সেই মেয়েটীর মায়াস্বপ্নে মুগ্ধ হইয়া পুলকের দিনগুলি সুখে সচ্ছন্দে সুখস্বপ্নের মতই কাটিয়া যাইতেছিল। শৈশব অতিক্রম করিয়া যুঁই ক্রমে বাল্যে পদার্পণ করিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বালিকার বাল সুলভ চপলতা ও দুরন্তপনাও অসম্ভব বাড়িয়া উঠিতেছিল, সেজন্য লীলা শাসন করিতে আসিলে পুলক বারণ করিত, বিরক্ত হইত। সেজন্য লীলা রাগ করিয়া বলিত, "এখন থেকে শাসন বারণ না করলে

শেষে মেয়ে যে তোমার ধিঙ্গি হয়ে উঠবে।"

পুলক সে কথায় বলিত, "তা উঠুক,—আমি তো তাই চাই! আমার যুঁই যে নেহাত বাঙ্গালী ঘরের মেয়ের মত শাসন সঙ্কোচের মধ্যে ভয়ে ভয়ে মানুষ হয়ে একটা জড়-ভরত গোছ হয়ে যাবে, সেটা আমি মোটেই পছন্দ করি না। ওকে তুমি খুব খেলতে দাও, খুব দুষ্টুমী করতে দাও, তোমার শাসনের চাপে পিষে মেয়েটার সরল মনোবৃত্তিগুলি স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিটুকু তুমি নষ্ট করে দিও না লিলি!—দোহাই তোমার।"

সুতরাং লীলার সেদিকে কোনই অধিকার ছিল না। প্রতিবেশিনী অরুর মা'র কাছে, বাড়ীর চাকর দাসীদের কাছেও এজন্য লীলাকে আক্ষেপ করিতে দেখা যাইত, "উনি খালি আদর আস্কারা দিয়ে দিয়ে মেয়েটার পরকাল একেবারে ঝর ঝরে করে দিচ্ছেন।"

আদরিণী যুঁইর পিতার ঘরেও অবারিতদ্বার ছিল। সে ঝি'দের ধর পাকড় ও মাতার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মাঝে মাঝে প্রায়ই পুলকের নিভৃত ঘরটীতে ঢুকিয়া পড়িত এবং তাহার কাগজপত্রগুলি ইচ্ছামত ঘাঁটিয়া—এটা কি বাবা! ওটা অমন কেন?—এ মা! এটাতে এমন হিজিবিজি করেছ কেন?—এমনি সব সম্ভব ও অসম্ভব প্রশ্ন তুলিয়া পুলকের সময় নষ্ট করিত। কিন্তু পুলকের তাহাতে একটুও বিরক্তি ছিল না।

পুলকের লাইব্রেরী ঘরের যে জানালাগুলি বাগানের দিকে খোলা থাকিত সেই দিকে কত সময় মাতাকে লুকাইয়া আসিয়া

যুঁই কতবার 'টু' ! করিয়া যাইত,—জানালা গলাইয়া ফুল, পাতা কি কিছু একটা জিনিষ আচম্‌কা ছুড়িয়া ফেলিয়া লিখনরত পিতাকে চমকিত করিয়া হাসিতে হাসিতে সে ছুটিয়া পলাইত। বালিকার এই দুষ্টামীগুলিও পুলকের বড় ভাল, বড় মিষ্ট লাগিত। তাহার খেলা ধূলা, হাসি দুষ্টামী, সমস্তই পুলকের তরুণ যৌবনে আঘাত খাওয়া মুস্‌ড়াইয়া পড়া মনখানিতে একটা নব সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করিয়া ধীরে ধীরে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। ঐ মেয়েটীই তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিল।

চারি বৎসর বয়সের সময় একবার যুঁইয়ের কঠিন পীড়া হয়, তাহার স্বাস্থ্য জন্মাবধি বেশ ভালই ছিল, অসুখ বিসুখ বড় একটা করে নাই, তাই কন্যার এই প্রথম ও কঠিন পীড়ায় লীলা এতই ঘাব্‌ড়াইয়া গেল যে তাহার দ্বারায় পীড়িতার সেবা শুশ্রূষা হওয়া তো দূরের কথা বরং মনের দারুণ অস্থিরতায় সে তাহাকে ঔষধ দিতে ভুল করিয়া, দুধ খাওয়াইতে গায়ে ঢালিয়া ফেলিয়া, মাথায় বালিস দিতে ঘাড়ে আঘাত দিয়া বিষম অনর্থ বাঁধাইয়া তুলিল। সেজন্য স্বামীর কাছে তিরস্কৃত হইয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি ওসব আর পারি না বাপু! আমার যেন হাত পা সরে না। তার চেয়ে একটা ভাল ন্যর্স আনিয়ে নাও না।"

কিন্তু প্রাণাধিকা দুহিতাকে ন্যর্সের তত্ত্বাবধানে রাখিতে পুলকের প্রবৃত্তি হইল না, সে তাহার সেবা শুশ্রূষার ভার

নিজেই গ্রহণ করিল। যদিও এই মেয়েটীর জন্য তাহার প্রাণে ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না, তথাপি অবসন্ন দেহে মনের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অসামান্য ধৈর্য্যের সহিত সর্ব্বক্ষণ সজাগ সতর্ক থাকিয়া পুলক তাহার একমাত্র স্নেহের নিধিটীকে যক্ষের মত বুকে বুকে চোখে চোখে আগুলিয়া রাখিত। স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া লীলাও অবাক হইয়া গেল।

তখন কন্যার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া পুলক সশঙ্ক ব্যাকুল চিত্তে কেবল ভাবিত, বালিকা যুঁই, তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন যুঁই,—যদি না বাঁচে!—যদি এই দুরন্ত করাল ব্যাধি তাহার স্বরগের এই পুণ্য আলোটুকুকে নিঃশেষে নিভাইয়া দেয়!—না না, ভগবান! দয়াময়! রক্ষা কর, রক্ষা কর!

পুলকের অন্ধকার দিশেহারা জীবনের একমাত্র সমুজ্জ্বল ধ্রুব-তারার মত, চঞ্চল সুনির্ম্মল স্নিগ্ধ নির্ঝরিণী ধারার মধুর কলোচ্ছ্বাসময় আনন্দ সঙ্গীতের মত, সেই ছোট্ট মেয়েটী,—যে তাহার সরল হৃদয়ের অফুরন্ত আলো, হাসি, গান দিয়া তাহার দুর্ভাগ্য পিতার ব্যর্থ জীবনের সকল শূন্যতা, সকল অভাব পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে হারাইলে সর্ব্বহারা পুলক বাঁচিয়া থাকিবে আর কি লইয়া? পিতৃহৃদয়ের সেই ব্যাকুল একাগ্র প্রার্থনায় দয়াময় ভগবান কর্ণপাত করিলেন; পুলকের অক্লান্ত অশ্রান্ত শুশ্রূষায় যুঁই সে যাত্রা রক্ষা পাইল।

এইভাবে, সেই মায়াময়ী স্নেহের পুতলীটাকে কেন্দ্র করিয়া

পুলক যখন তা'র ছিন্নভিন্ন জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট ও লক্ষ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইয়াছিল, ঠিক সেই সময় হঠাৎ একদিন একখানি পত্র অতর্কিতে আসিয়া পুলককে পুনরায় দিক্‌ভ্রান্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল,—স্রোতহীন শান্ত সরোবরে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, তাহার স্থির অচঞ্চল বারিরাশি যেমন নিমেষে আলোড়িত চঞ্চল হইয়া উঠে, সেই ক্ষুদ্র পত্রখানি পুলকের শান্ত সংযত চিত্তে স্মৃতির বিক্ষোভ তুলিয়া তেমনি একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া দিল।

সাত

সে চিঠিখানা আসিয়াছিল সুদূর ব্রহ্মদেশ হইতে লীলার নামে। লেখক তাহার ভ্রাতা মলয়। মলয় লিখিয়াছে, তাহার একমাত্র পুত্র মুকুলের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সে তাহাকে লীলার কাছে পাঠাইতে চায়। মধ্যে তাহার কঠিন পীড়া হইয়াছিল, সেই অবধি ছেলেটি আর সামলাইতে পারিতেছে না। ডাক্তাররা একবাক্যে 'চেঞ্জের' পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু মুকুল এখনও বড় ছেলেমানুষ, সেজন্য কোনও স্কুল বোর্ডিংয়ে রাখিতে ভরসা হয় না। এখন লীলা যদি তাহাকে কিছুদিন নিজের কাছে রাখে, তবেই ছেলেটীর জীবনের আশা করা যায়। লীলা তাহার স্বামীর অভিমত লইয়া পত্র দিলেই, সেখান হইতে যে একজন ভদ্রলোক সম্প্রতি কলিকাতায় আসিতেছেন, তাঁহার সহিত মুকুলকে স্বচ্ছন্দে পাঠাইয়া দিতে পারে। মুকুলের জন্য তাহার মাতা বড়ই উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দয়ায় যদি ছেলেটী তাহার নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়, তাহা হইলে তাহারা স্বামী স্ত্রী আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিবে—ইত্যাদি।

চিঠিখানা হাতে লইয়া লীলা স্বামীর কাছে গেল। পুলক তখন তাহার একখানি নূতন বইয়ের প্রুফ দেখিতেছিল, স্ত্রীর হস্তে পত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কা'র চিঠি লিলি?"

লীলা হাসিভরা মুখে সপরিহাসে বলিল, "বল দেখি কা'র ?"

"না দেখে কি করে বলব ? আমি তো অন্তর্য্যামী নয় !"

"তবে দেখেই বল—"

লীলা চিঠিখানা স্বামীর কোলের উপর ফেলিয়া দিল। খামখানার উপর বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "এ যে তোমার নামে দেখছি।"

"তা হ'ক না, তুমি পড় তো !"

"নাঃ ! পরের চিঠি পড়া আমার কোনও কালে অভ্যাস নেই।"

"বুঝেছি ! দাদা তোমাকে চিঠি না দিয়ে আমাকে দিয়েছেন, তাই বুঝি তোমার মনে হিংসে হচ্ছে ?"

পুলক কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল, "সে সব আশা বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি লিলি !—তোমার দাদা বিয়ে করে এখন আর এক মানুষ হয়েছেন, আর কি সে বন্ধুত্বের কথা তা'র মনে আছে ? তবে তোমার যে আজ হঠাৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ল কেন—"

বাধা দিয়া লীলা সহাস্যে কহিল, "ভাগ্য প্রসন্ন কি সাধে হয়েছে গো ! ওদিকে একটা ভারি দরকার পড়েছে যে !"

পুলক সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের দরকার ?"

"চিঠিখানা একবার পড়েই দেখ না, তা'হলেই টের পাবে।"

পত্র পাঠ করিয়া পুলকের মুখের ভাব বদলাইয়া গেল। বক্ষের স্পন্দন দ্বিগুণ দ্রুত হইল। স্বামীর এ পরিবর্ত্তনটুকু লীলা অন্যভাবে গ্রহণ করিয়া কিছু কুণ্ঠার সহিত বলিল, "সত্যি ;

এটা কিন্তু দাদার অন্যায়, পরের ছেলের ভার নেওয়া তো অমনি মুখের কথাটী নয়,—তা'হলে কি উত্তর দেওয়া যায় ?"

"উত্তর আমিই লিখে দিচ্ছি।"

পুলক টেবিলের উপর হইতে একখানা টেলিগ্রামের ফরম লইয়া মলয়কে লিখিয়া দিল, "মুকুলকে নির্ভাবনায় পাঠাইয়া দিতে পারো, কলিকাতায় তাহার পৌঁছিবার সময় ও তারিখ জানাইবে।"

স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত সদয় ব্যবহারে লীলা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "তুমি যে এত সহজে রাজি হবে, তা মনেও ভাবিনি আমি—আশ্চর্য্য লোক তুমি কিন্তু !"

"কেন ? এতে আশ্চর্য্য হ'বার কথাটা কি আছে লিলি ! তুমি যাকে এইমাত্র পর বল্লে, সে তো আমাদের সত্যি সত্যি পর নয় ! নিকট আত্মীয়।"

লীলা ঈষৎ অপ্রতিভ কুণ্ঠিত স্বরে কহিল, "মানলুম মুকুল আমাদের পর নয়, সে আমার ভাইপো,—কিন্তু স্ত্রীর ভাইপোর ওপর ক'জন পুরুষের আন্তরিক টান থাকে, বল দেখি ? স্ত্রীর আত্মীয় কুটুম্ব নিয়ে কি সহজে কেউ ঘর করতে চায় ?"

স্ত্রীর কথায় পুলক হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "তোমার এ মন্দ ধারণা তো নয় লিলি !—কিন্তু তুমি আমাকে যতখানি সাধু-পুরুষ মনে করছ, বাস্তবিক আমি তা নই ! মুকুল আমার কে তা বুঝি ভুলে গেছ লিলি ? সে যে মলয়ের ছেলে, আমার বন্ধু পুত্র !"

"ও হো! খুড়ি খুড়ি! ও কথাটা আজকাল আমার মনেই থাকে না ছাই!—কি করেই বা থাকে বল? দাদার যা বন্ধুত্বের টান!—সাত জন্মে একবার খোঁজও নেন না!"

"তা হোক্। তুমি এই বেলা 'তার'টা পাঠিয়ে দাওগে লিলি! এর প'র আর সময় থাক্‌বে না।"

লিখিত টেলিগ্রামখানা লইয়া লীলা উঠিয়া গেল। পত্নী দৃষ্টির অন্তর হইবামাত্র পুলক তাহার এতক্ষণকার যত্নরুদ্ধ হৃদয়াবেগ মুক্ত উৎসারিত করিয়া দিল। এতদিন এই সুদীর্ঘ-কাল পরে আবার সেই ব্যথা ভরা যূথিকা স্মৃতি অম্লান উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আবার সেই! হায়রে!—মরমের গভীর ক্ষত যে এখনও ভাল শুকায় নাই! প্রাণের আগুণ যে এখনও নিঃশেষে নিভে নাই, শুধু ছাই চাপা পড়িয়াছে মাত্র, ইহারই মধ্যে আবার একি বিপত্তি!

অতীতকে জোর করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া অনবসর অশ্রান্ত সাহিত্য সাধনা ও উচ্ছ্বল উদ্দমে, অপত্য স্নেহের মধ্যে নিমজ্জিত পুলক এতদিন যাহার বেদনাময় স্মৃতি বিস্মৃতির তলে ডুবাইয়া দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, সেই বিলীয়মান বিস্মৃত-প্রায় স্মৃতি পুনরায় উদ্দীপিত করিয়া পুলকের বহু আয়াস ও তপস্যা লব্ধ, এই শান্তিসুখ, এই স্বস্তিটুকু নষ্ট করিয়া দিবার জন্য আবার এ নূতন আয়োজন কেন?

হায় যূথিকা!—কুহকিনী যূথিকা!—তোমার অভিশপ্ত স্মৃতির কুহক মায়া কি চিরদিন চিরজন্ম পুলকের ভাগ্য বিড়-

ম্বিত জীবনে অদৃষ্ট দেবতার নিদারুণ নিষ্ঠুর অভিশাপের মত ঘেরিয়া জড়াইয়া থাকিবে? মুক্তি কি সে সারাজীবন ভোর পাইবে না? না, না, মলয়! নিষ্ঠুর মলয়! ভাগ্যহীন বন্ধুকে এখনো নিষ্কৃতি দাও বন্ধু আমার! হৃদয়হীন নির্ম্মমের মত তাহাকে আর ব্যথার উপর ব্যথা দিয়া নির্য্যাতিত করিও না!

দিনকয়েক পরেই মলয়ের টেলিগ্রাম আসিল, মুকুল তাহার ধাত্রীর সহিত রওয়ানা হইয়াছে এবং অমুক তারিখে, অমুক সময় সে কলিকাতায় পুঁহুছিবে।

যথাসময় পুলক কলিকাতায় গিয়া তাহার বন্ধুপুত্রকে লইয়া আসিল। আট বছরের ছেলে মুকুল সহসা সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকেদের মধ্যে আসিয়া বড় কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। সলজ্জ নতমুখে সে আসিয়া যখন তাহার পিসীমাতাকে প্রণাম করিল, তখন লীলা ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া কিছু বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "ওমা একি গো? এইটী বুঝি দাদার ছেলে? তা এত কাহিল কেন? মুখ চোখ চেহারাও তো বাপের সঙ্গে কিছুই মেলে না. ওর মা'ও তো খুব সুন্দর, তবে ছেলে এমন হ'ল কেন?"

কিন্তু ছেলেটীর চেহারা যে এককালে বাস্তবিক সুন্দর ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাহার ভাবুকের মত বড় বড় শান্ত নির্ম্মল চক্ষুদুটী, উন্নত নাসিকা, প্রতিভাময় প্রশান্ত ললাট, আতপতাপে পরিম্লান চম্পকের মত বিবর্ণ সুগৌর

কান্তিটুকু, এখনও তাহার রোগ-লুপ্ত সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিতেছিল।

প্রবীণা ধাত্রী সারদা, সে শুধু মুকুলকেই নয়, মুকুলের জননীকেও হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, তাই মুকুল সম্বন্ধে লীলার এই সমালোচনা শুনিয়া সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। মুকুলের সঙ্কোচনত মুখখানির দিকে ব্যথা করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে সদুঃখে বলিল, "আহা! মা! ওর আগেকার সে সুন্দর চেহারাখানি যদি দেখ্তে! যেন রাজপুত্তুরটী ছিল! কি যে কাল রোগে ধরল, বাছার দেহে আর কিছু পদার্থ রইল না। এখন প্রাণে প্রাণে রক্ষে পায়, সেই যথেষ্ট। আহা! ওর মা'র যে এই ছেলেটুকুই প্রাণ!—ছেলে সারবে বলেই না পাষাণে বুক বেঁধে এই এত দূরে সাত সুমুদ্দুর তেরো নদীর পারে পাঠিয়ে দিয়েছে!—নইলে সে তো কখনও ছেলেটীকে একদণ্ড চক্ষের আড়াল করেনি।"

কথাটা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সারদার চক্ষু দুটী ছল ছল করিয়া আসিল। মায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপনে সেই মাতৃক্রোড় হইতে সদ্য বিচ্ছিন্ন সদ্য বিরহকাতর বালকের ম্লান নয়নেও অশ্রুর আভাস জাগিয়া উঠিল।

সেই সকরুণ দৃশ্য পুলকের স্বভাব কোমল চিত্তে আর এক নূতন বেদনার সৃষ্টি করিল। সে তখন এই অপ্রিয় প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল, "মুকুলের কাপড় চোপড় এইবেলা ছাড়িয়ে দাও ধাইমা! আর লিলি! তুমি একটু

শীগ্‌গির করে ওর খাবার যোগাড় করে দাও গে,—ছেলেটা কতদূর থেকে হা'ক্লান্ত হয়ে এসেছে। এস মুকুল! তোমাকে তোমার ঘরখানা দেখিয়ে আনি!"

লীলা "এই যে যাই,—কিন্তু অতটা মা'র কোল ঘেঁসা করতে নেই বাপু! ওতে ছেলে পিলের শরীর কখনও শক্ত হয় না, আর মা'রও কষ্ট—" বলিতে বলিতে মুকুলের আহারের ব্যবস্থা করিতে চলিল।

বালিকা যূঁই তাহার একজন নূতন খেলার সঙ্গী লাভের আশুসম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া মায়ের পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু এখন আগন্তুক বালকটীর আকৃতি প্রকৃতি দর্শনে বোধ হয়, সে সঙ্গী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কতক নিরাশ হইয়াই মায়ের পাছু পাছু রান্না ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল।

পুলক একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নির্ব্বাক মুকুলের হাত ধরিয়া তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কামরার দিকে অগ্রসর হইল। সেই সাত সুমুদ্দুর তেরো নদীর ব্যথা, তাহার অন্তরখানিকে তখনও প্রপীড়িত করিতেছিল।

আহার ও খানিক বিশ্রামের পর যূঁই মুকুলকে লইয়া পিতার কাছে আসিল, বলিল, "খাওয়া দাওয়া, আরাম করা, সব হ'ল তো বাবা? এইবার মুকুলকে আমার খেলার ঘর বাগান টাগান সব দেখিয়ে আনি?"

মুকুলের সহিত কন্যার বন্ধুত্ব স্থাপনের আগ্রহ দেখিয়া পুলক সস্নেহ-হাস্যে কহিল, "বেশ, তা যাও, কিন্তু দেখ—"

যুঁই পিতার আদেশ জানিবার জন্য যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইল, পুলক বলিল, "মুকুল এখনও বড় ক্লান্ত, অনেক দূর থেকে এসেছে কিনা? ওকে নিয়ে আজই বেশী ছুটোছুটী করো না, বুঝলে রাণী?"

ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া যুঁই মুকুলের হাত ধরিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল। বালক বালিকার দিকে চাহিয়া লীলা সস্মিত মুখে বলিল, "দেখ, মুকুল যুঁইয়ের চেয়ে প্রায় বছর খানেকের বড়ই হবে, কিন্তু বলতে নেই, আমাদের যুঁইয়ের কাছে ওকে কত ছোট, কত কাহিল দেখাচ্ছে!"

পুলক দুঃখিত স্বরে বলিল, "রোগ এমনি জিনিষ লিলি! সবলকে দুর্ব্বল, সুন্দরকে কুৎসিত করে দেয়। ছেলেটীকে ভারি সাবধানে রাখতে হবে। তা'রা আমাদের ওপর নির্ভর করে এত দূরে পাঠিয়ে দিয়েছে, তা'তে আবার শুনলে তো মুকুলের মা'র কথা—ছেলেকে ছেড়ে—"

বাধা দিয়া লীলা অবজ্ঞাভরে বলিল, "সেটা তা'র ভুল! ছেলেপুলেকে বেশী মা নেজুড়ে করা ঐ তো যত নষ্টের গোড়া! এই তো আমাদের যুঁইও রয়েছে, মুকুলের চেয়ে বয়সে সে ছোটই হচ্ছে, কিন্তু আমার পরওয়া সে রাখে নাকি?"

পুলক আর কথা বলিল না, সে নীরবে মনে মনে বিচার করিতে লাগিল, কিন্তু এইটাই কি ভাল? জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যখন অসহায় সুকুমার শিশুচিত্ত, সৃষ্টি কর্ত্তার বিচিত্র বিধানে অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ সুখ পাইবার জন্য স্বতঃ উন্মুখ হইয়া উঠে,

সে সময় তাহাদের এমন আলগাভাবে দূরে সরাইয়া রাখা কি পিতামাতার পক্ষে উচিত?

বালিকা যুঁই পিতার স্নেহময়-সঙ্গ এমন নিবিড়ভাবে পাইয়াছে বলিয়াই না মাতার প্রত্যাশা রাখে না? অতখানি পিতৃস্নেহ লাভের সুযোগ যদি বালক মুকুলের নাই হইয়া থাকে?

কিন্তু এই সামান্য কথা লইয়া স্ত্রীর সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে পুলকের ইচ্ছা ছিল না, তা'ই সে অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া কহিল, "যুঁইয়ের সঙ্গে মুকুলের এরি মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে, না?"

লীলা হাসি মুখে সগর্ব্বে কহিল, "ভাব করতে তোমার মেয়েটীর কি দেরি লাগে নাকি? ও যে পথের লোককে ডেকে ভাব করে।"

"আচ্ছা রাত্তিরে মুকুলকে কোথায় শোওয়াবে বল দেখি? আমাদের শোবার ঘরে না—"

"না না, তা কেন? সারদা বলছিল খুব কচিবেলা থেকেই নাকি মুকুলের ন্যার্সের কাছে শোওয়া অভ্যেস, এখন ন্যার্স তো নেই সারদার কাছেই শোয়। এখানেও তাই শোবে।"

পুলক শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, "ওরে বাস্ রে! একেবারে ন্যার্সের কাছে ছেলে শোয়ান!—তোমার ভাইটী একেবারে পুরোদস্তুর সাহেব বনে গেছেন লিলি!—কিছু আর বাকি নেই!"

স্বামীর বিদ্রূপে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া লীলা বলিল, "এ যে তোমার অন্যায় কথা বাপু!—ছেলের জন্য ন্যার্স রাখা বুঝি সাহেবিয়ানা হ'ল?"

আট

"মানব চরিত্র গঠিত হয় কি প্রকারে?—শিক্ষা সংসর্গ ও ঘটনা চক্রে পড়িয়া। কিন্তু একথায় আমাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে এই শিক্ষা সংসর্গ জিনিসটী সকল ক্ষেত্রে সমান ফলপ্রসূ হয় না কেন? হয়তো দুটী ভাই বোন, একই শিক্ষা একই সংসর্গের মধ্যে আজন্ম প্রতিপালিত বর্দ্ধিত হইয়াছে, অথচ তাহাদের দুইজনের চরিত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন—"

পুলকের দ্রুত চালিত লেখনী স্থগিত করিয়া দিয়া দ্বারে শব্দ হইল ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্! সেই ক্ষুদ্র কোমল করস্পর্শের মৃদু শব্দটুকু পুলকের চির পরিচিত। তথাপি একটু রঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে জোর গলায় বলিল, "কেরে?"

মৃদু মিষ্ট স্বরে উত্তর আসিল, "আমি, বাবা!"

"আমি কে?"

"আমি যুঁই।"

পুলক হাসিতে হাসিতে বলিল, "দোর তো খোলাই রয়েছে মণি! ভেতরে আয় না!"

ভিতরে আসিবার জন্য অন্যদিন যুঁইকে সাধিতে হইত না, কিন্তু আজ সে একা নহে, মুকুলও তাহার সঙ্গে ছিল। তাই স্প্রীং দেওয়া দরজাটা খানিক ফাঁক করিয়া, ছোট্ট মুখখানি ঘরের ভিতর বাড়াইয়া সে মিষ্ট

কোমল বাক্যে কহিল, "আমি একা নয় বাবা, মুকুলও তোমার কাছে একবারটী আসতে চায়।"

"বেশ তো, তাকেও নিয়ে এস না।"

যুঁই পিতার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার অবারিত অকুণ্ঠিত অধিকার লইয়া হাসিভরা উজ্জ্বল মুখে, আনন্দ চঞ্চল বসন্তের মধুর বাতাসটুকুর মত, এবং তাহারই পিছনে ধীরে ধীরে আসিল মুকুল তাহার প্রতি পদক্ষেপে অনধিকার প্রবেশের সঙ্কুচিত ত্রস্তভাব স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছিল।

যুঁই বলিল, "বাবা! আজ বর্ম্মা থেকে মুকুলের চিঠি এসেছে, তাই তোমার কাছে পড়াবে বলে এনেছে—দাও না মুকুল বাবাকে চিঠিখানা।"

সঙ্কুচিত মুকুলের পানে চাহিয়া পুলক জিজ্ঞাসা করিল. "কই দেখি কা'র চিঠি মুকুল!"

মুকুল প্রফুল্ল বদনে কহিল, "মা'র চিঠি!" তাড়াতাড়ি সে চিঠিখানা পুলকের সম্মুখে ধরিল। যূথিকার চিঠি!—কতদিন, কতকাল পরে, এই ক্ষুদ্র পত্রখানি যূথিকার সেই শ্বেত শতদলের পাপড়ীর মত সুন্দর কোমল করের সুখময় মধুর স্পর্শটুকু লইয়া আসিয়াছে! এ সুযোগ এ সৌভাগ্য যে পুলকের জীবনে ঘটে নাই! কম্পিত করে পত্রখানি গ্রহণ করিয়া সে বলিল, "তুমি নিজে পড়তে পারো না মুকুল?"

মুকুল কিছু লজ্জিত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আমি চিঠি পড়েছি পিসেমশাই! তবু যদি কোথাও ভুল থেকে গিয়ে থাকে, তা'ই একবার দেখাতে নিয়ে এলুম।"

পুলক উচ্ছ্বসিত মনোভাব সম্বরণ করিয়া মুকুলকে শুনাইয়া চিঠি পড়িতে লাগিল—

স্নেহের মুকুল আমার!

এখান থেকে তুমি চলে গিয়ে আমার ঘর দুয়ার সমস্তই যে অন্ধকার হয়ে গেছে ধন! তুমি ওখানে গিয়ে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে, বেশ মনের আনন্দে আছ তো? ওখানে তুমি বেশ ভাল করে থেকো, তোমার পিসীমা যা বলেন, তা মন দিয়ে শুনো। কোনও রকম অবাধ্যতা বা লজ্জা সঙ্কোচ করো না, লক্ষ্মী সোনা আমার!

আশা করি, ভগবানের করুণায় তুমি শীঘ্রই আবার সুস্থ শরীরে হাসিমুখে আমার কোলে ফিরতে পারবে। তোমার কচি হাতের লেখাটুকু মাঝে মাঝে আমাকে পাঠাতে ভুলো না মাণিক!—সেইটুকুই এখন আমার সান্ত্বনা—"

ছোট্ট একখানি চিঠি! স্নেহময়ী তরুণী মাতা সুদূর প্রবাসী বালক পুত্রটীকে তাহার অপত্য বিরহ বিধুর আর্ত্ত হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও স্নেহের উচ্ছ্বাস দুটী কথায় ব্যক্ত করিয়াছে মাত্র, কিন্তু সেই কয়েক ছত্র লেখা পুলকের মনকে এমন অশান্ত বিচলিত করিয়া তুলিল কেন?

চিঠি পড়া শেষ করিয়া পুলক অস্বাভাবিক গাঢ়কণ্ঠে কহিল, "এচিঠির উত্তর তুমি নিজেই লিখ্‌তে পারবে তো মুকুল?"

মুকুল সোৎসাহে বলিল, "হ্যাঁ পিসেমশাই খুব পারব,—যদিও

আমার লেখা তেমন ভাল নয়,—অসুখের পর আমার লেখাপড়া সবই মা ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন কিনা ?”

পুলকের তখন বড় ইচ্ছা হইতেছিল সে নিজের হাতেই দুই ছত্র লিখিয়া যূথিকাকে জানাইয়া দেয়, তাহার স্নেহের নিধিটীকে পুলক প্রাণপণ যত্নে রক্ষা করিবে। কিন্তু কেন ? কিসের জন্য ?

সমস্ত পত্রখানির মধ্যে তো কুত্রাপি তাহার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই যেন সে তাহাদের সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় নিরাত্মীয় একজন !

অভিমান ও ক্ষোভে পূর্ণ হইয়া পুলক একটা গাঢ় নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “আচ্ছা তুমি তবে আজ কালের মধ্যেই চিঠিখানার উত্তর লিখে দিও কেমন ?”

“হ্যাঁ পিসেমশাই !” আনন্দিত স্মিত মুখে মুকুল মার পত্রখানি লইয়া যুঁইয়ের সহিত চলিয়া গেল।

ছেলে মেয়ে দুটীর পানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া পুনরায় একটা ব্যর্থতার ব্যথাভরা আকুল নিঃশ্বাস পুলকের বক্ষ কাঁপাইয়া বাহির হইয়া গেল।

হায় অদৃষ্ট ! যূথিকার চিন্তা, যূথিকার স্মৃতি সযত্নে পরিহার করিয়া সে যতই দূরে সরিয়া যাইতে চায়, ততই এ মোহপাশের বন্ধন, নাগপাশের মত দুশ্ছেদ্য নিবিড়তর হইয়া তাহাকে এমন আষ্টে পৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিতেছে কেন ?

যূথিকার ঐ লিখনটুকু বালকের কাছে চাহিয়া লইয়া,

একবার গোপনে নিভৃতে তৃষিত তাপিত বক্ষের মাঝে চাপিয়া ধরিবার জন্য তাহার পাপ মনে আজি এ আকুল অধীর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছে কেন? যূথিকা তাহার কে?—তাহার আশা আনন্দপূর্ণ জীবনের সে সুখ-হন্ত্রী শান্তিহারিণী!—তবে? হায়! বৃথা—বৃথা তাহার এই প্রয়াস!—যূথিকাকে পুলক এ জীবনে ভুলিতে পারিবে না।

স্বামীর ঘরের দিকে ছেলেমেয়েদের সাড়া শুনিতে পাইয়া লীলা যখন তাহাদের নিরস্ত করিবার জন্য তাড়াতাড়ি সেদিকে আসিল, তখন ভাইবোন দুটী নিজস্থানে ফিরিয়া গিয়াছে।

দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়া লীলা দেখিল অসমাপ্ত রচনা ফেলিয়া রাখিয়া স্বামী গম্ভীর মুখে নীরব। ছেলেরা তাঁহার কার্য্যে বাধা দিয়া বিরক্ত করিয়াছে এই মনে করিয়া সে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া অপ্রসন্নকণ্ঠে কহিল, "ছেলেমেয়ে দুটোকে এত বারণ করি, তবু কেবল তোমার ঘরে এসে জুটবে! এমন দুষ্টু হয়েছে! তুমিই তো আস্কারা দিয়ে দিয়ে ওদের এমন ভয়ভাঙ্গা করেছ।"

যূথিকার নিবিড় চিন্তার মাঝখানে পত্নীর সহসা আবির্ভাবে পুলক কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল। সে ম্লানমুখে জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "না লিলি! ওরা তো কিচ্ছু করেনি,—মিনিট কতকের জন্যে এসেছিল, একখানা চিঠি পড়াবার জন্যে—"

"চিঠি! কা'র চিঠি? কোথা থেকে এল?"

"মুকুলের চিঠি, বর্ম্মা থেকে এসেছে।"

"বর্ম্মা থেকে? দাদা লিখেছেন বুঝি?"

"না, ওর, মা—"

"ওঃ! তা আমার কাছে পড়িয়ে নিলেই হ'ত!—খামখা তোমাকে বিরক্ত করবার কি দরকার ছিল? আজ ওদের ভাল করে—"

"না না, তুমি ওদের ওপর মিথ্যেই রাগ করছ লিলি! ও বেচারারা আমার কাজে কখনই বাধা দেয় না। তুমি বরং দেখগে, ওরা রোদে বেড়াচ্ছে না তো?—এই বাগানের দিকে খেলতে বলে দাও।"

লীলা 'যাই' বলিয়া গেল না, সেইখানেই জাঁকাইয়া বসিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খাতাপত্রগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে সে একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, এত রকম ভাব এক সঙ্গে তোমার মাথায় আসে কেমন করে বল তো?—গল্প, উপন্যাস, পদ্য সবই এক সঙ্গে চলছে!—আমরা হ'লে তো একদম মাথা গুলিয়ে ফেল্‌তুম।—এটা আবার কি লেখা হচ্ছে?—দেখি দেখি—"

পুলকের সম্মুখ হইতে তাহার মানব চরিত্র গঠন অসমাপ্ত প্রবন্ধটী সাগ্রহে টানিয়া লইয়া লীলা খুব মনোযোগের সহিত পড়িয়া ফেলিল, তাহার পর মুখখানি একটু ভার করিয়া বলিল, "ও! বুঝেছি!"

তাহার মুখের পানে চাহিয়া পুলক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিল, "কি বুঝেছ লিলি?"

লীলা অভিমানভরে কহিল, "এ প্রবন্ধটী যে আমাদের ভাই বোনকে লক্ষ্য করেই লেখা হয়েছে, তা আমার মতন গণ্ডমূর্খও অনায়াসে বলে দিতে পারে!"

সংসারে এমনও কতকগুলি লঘুচিত্ত লোক আছে, যাহারা ভাবের ঘরের ত্রিসীমানাতেও কখন পদার্পণ করে না অথচ, ভাবুক লেখকদের মনের স্বতঃ প্রণোদিত গভীর ভাবপূর্ণ রচনাগুলির প্রকৃত তথ্য গ্রহণ করিতে না পারিলেও তৎসম্বন্ধে যথেচ্ছা সমালোচনা করিতে ছাড়ে না।

আমাদের লীলা ছিল এই প্রকৃতির লোক। তবে পুলকের সৌভাগ্যক্রমে এমন ঘটনা প্রায় সচরাচর ঘটিত না, লীলা নিজেই তাহার লেখাপড়ার দিকে বেশী ঘেঁস দিত না, তাই রক্ষা। যেদিন দিত সেদিন এমনি কত অসম্ভব কল্পনা জল্পনা ও অদ্ভুত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সে পুলককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত।

আজ পুলকের গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে এই ভাই বোনের উদাহরণটুকু তাহাদেরই ভ্রাতা ভগিনীর চরিত্রগত অসামঞ্জস্যের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত মনে করিয়া লীলা স্বামীর উপর কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল।

পত্নীর আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতায় হাসিয়া ফেলিয়া পুলক মিনতি কোমল কণ্ঠে কহিল, "দোহাই লিলি! না বুঝে সুঝে তুমি হঠাৎ এমন একটা ভুল ধারণা করে বসো না, লক্ষ্মীটী!—তোমাদের ভাই বোনের সঙ্গে আমার লেখার কোনই সম্পর্ক নেই,—এ

শুধু আমার মনের খেয়াল মাত্র। এখন কাগজখানা দাও দেখি লেখাটা আজই শেষ করে ফেলতে হবে। কাল্‌কের ডাকে না পাঠালেই নয়।"

লীলা স্বামীর কথায় প্রত্যয় করিল কি না বলা যায় না, কিন্তু সে আর কিছু না বলিয়া কাগজখানা রাখিয়া দিয়া কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেল। পুলক যেন হাঁফ্‌ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ অস্থির চিত্ত লইয়া সে তখন আর কাজে মন দিতে পারিল না, ক্লান্ত মস্তিষ্ক, শ্রান্ত মনকে বিরাম দিবার জন্য পুলক বাগানের দিককার খোলা দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। সেস্থান হইতে উদ্যানের ছায়াশীতল ঘন সবুজ শ্যামলতার স্নিগ্ধ ছবিটুকু অবাধে দেখিতে পাওয়া যায়।

নয়

পুলক দেখিল একটা পত্রবহুল কামিনী গাছের ছায়ায় বালক বালিকা দুটী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। যুঁই হাসিয়া হাসিয়া হাত মুখ নাড়িয়া কি সব বলিতেছে, আর মুকুল নীরবে, মনোযোগের সহিত তাহা শুনিতেছে।

দুইজনেই শিশু, দুইজনই প্রায় সমবয়স্ক, কিন্তু উভয়ের আকৃতি প্রকৃতিতে কতখানি পার্থক্য!

স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল, স্ফূর্ত্তিতে চঞ্চল বালিকা যুঁই, যেন প্রভাতের শিশিরে ভেজা, সদ্যস্ফুট পুষ্পস্তবকের মত সুন্দর লাবণ্যময়, আর মুকুল, যেন নিদাঘ মধ্যাহ্নের আতপ তাপে ম্লান কচি কিশলয়ের মত বিশীর্ণ হতশ্রী!

একজন উচ্ছল আনন্দের অমলিন সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি, আর একজন শান্তি ও গাম্ভীর্য্যের প্রশান্ত ছবি! একজন চঞ্চল, একজন স্থির—যেন আলো ও ছায়া দুটী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে!

দুহিতার স্বাস্থ্যপূর্ণ নিটোল সৌন্দর্য্যটুকু পুলককে যেমন আনন্দিত করিল, সেই নষ্ট স্বাস্থ্য শীর্ণ বালকটীর করুণ ছবি তাহাকে তেমনই ব্যথিত করিয়া তুলিল। তাহাকে সহসা দেখিতে পাইয়া যুঁই "ঐ যে বাবা!" বলিয়া চঞ্চল মৃগশিশুর মত অধীর চরণে ছুটিয়া আসিয়া সানন্দে কহিল, "আজ যে তোমার এরি মধ্যে কাজ করা হয়ে গেল বাবা?"

পুলক স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিল, "না মা, কাজ তো এখনো ঢের বাকি—তোমরা দুজনে কি রকম খেলা করছ তাই একবারটী দেখতে এলুম।"

পিতার কথায় যুঁই একটু দুঃখিত ভাবে কহিল, "কি খেলা খেলব বাবা?—মুকুলটা যে একদম্ কিছুই পারে না!—সে না জানে গাছে চড়তে, না পারে 'ঝাঁপ' খেতে, না পারে ছুটোছুটী করতে, সে এমন ধারা কেন বাবা?—মা বলেন ছেলে মানুষের অত জবুথবু হওয়া ভাল নয়।"

অদূরে দণ্ডায়মান মুকুলের পানে সস্নেহ করুণ নয়নে চাহিয়া পুলক স্নিগ্ধ আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, "মুকুল যে বড় দুর্ব্বল রাণী! দেখ্‌ছ না অসুখে ভুগে ভুগে ওর কি চেহারা হয়ে গিয়েছে! যতদিন মুকুল একটু সবল না হয়, ততদিন তুমি ওকে বেশী খাটুনীর কাজ করতে দিও না, বুঝলে তো?"

বালিকা যুঁই বালক মুকুলের প্রতি সহানুভূতি ও মমতা প্রদর্শন করিয়া কোমলস্বরে বলিল, "আচ্ছা বাবা! তাই হবে,—আজ থেকে আমি মুকুলকে আর কিচ্ছু বলব না, সে নিজেই যা পারে তাই করবে। কেমন?"

কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া পুলক সাদরে কহিল, "হাঁ মা! তুমি তো আমার লক্ষী মেয়ে!—যাও এখন খেলা করগে,—মুকুল তোমার অপেক্ষা করছে।"

পিতার আদর পাইয়া যুঁই আবদার করিয়া বলিল, "তুমিও চল না বাবা!—আমাদের খেলা দেখবে—"

"না মা! এখন তোমরা দুজনে মিলে খেলা করো, তারপর বাকি কাজটা সেরে আমিও আসছি।"

"তা হলে আমি তোমার জন্যে ততক্ষণ একটা ফুলের তোড়া তয়ের করিগে,—তুমি কিন্তু এসো নিশ্চয় বাবা!"

যুঁই যেমন আসিয়াছিল তেমনই অধীর ক্ষিপ্র গতিতে মুকুলের কাছে ফিরিয়া গেল।

পুলক সেইখানে পায়চারী করিতে করিতে দেখিতে পাইল বালিকা যুঁই মুকুলকে গাছের ছায়ায় দাঁড় করাইয়া, আপনি প্রজাপতির মত ছুটিয়া ছুটিয়া, বাছিয়া বাছিয়া নানা বর্ণের নানাজাতীয় ফুল তুলিয়া আনিতেছে এবং সেই সব আহৃত ফুলগুলি রুমালে রাখিয়া মুকুল সস্মিত মুখে তাহার আঘ্রাণ লইতেছে। বালক বালিকার কথোপকথনের মৃদুধ্বনিও মধ্যে মধ্যে শুনা যাইতেছিল।

দুহিতার এই সদয় শিষ্ট ব্যবহারে প্রীত হইয়া পুলক পুনরায় লিখিবার জন্য ঘরে ঢুকিলেন, এমন সময় যুঁইয়ের মিষ্ট চপল হাস্যকলোচ্ছ্বাসে আকৃষ্ট হইয়া সে ফিরিল। দেখিল ফুলতোলা ভুলিয়া গিয়া মুকুলের সামনে দাঁড়াইয়া খিল খিল করিয়া ক্রমাগত হাসিতেছে। আর মুকুল অপ্রস্তুত ম্লান ভাবে চুপটী করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ব্যাপার কি জানিবার জন্য পুলক তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেই যুঁই হাসিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া কৌতুক ভরে বলিয়া উঠিল, "ও বাবা! দেখেছ তোমার মুকুলের বিদ্যে?"

পুলক কাছে গিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে যুঁই ! মুকুল কি করেছে ?"

যুঁই হাসি উচ্ছ্বাস দমন করিতে করিতে বলিল, "মুকুল এত বড় ছেলে, কিন্তু কিচ্ছু জানে না বাবা ! একটা ফুলের নাম পর্য্যন্ত জানে না ! মল্লিকাকে বলে চামেলী ! গন্ধরাজকে বলে বিলিতী ফুল ! আর মাধবীলতা তো কখনো চক্ষেও দেখেনি ও, বলে কি না জংলী লতা !—হা হা হা !—কি বুদ্ধি রে ! মরে যাই !"

পিসে মহাশয়ের সম্মুখে নিজের এই অক্ষমতার বিষয় ধরা পড়িয়া যাওয়ায় অপ্রতিভ মুকুল হীনতার সঙ্কোচে দ্বিগুণ ম্রিয়মাণ ও লজ্জিত হইয়া পড়িল। পুলক তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিল, "বাঃ ! কে বল্লে মুকুল কিচ্ছু জানে না ? এইটুকুতে তুমি ওর বুদ্ধির কি পরিচয় পেলে যুঁই ? তুমি জান না মুকুল তোমার চেয়ে ঢের বেশী জানে। ও যে সব জিনিস দেখেছে তা কখনো বোধ হয় তুমি চক্ষেও দেখনি।"

যুঁই ঠোঁট ফুলাইয়া তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "আহা ! ছাই জানে ! আচ্ছা আমার চেয়ে বেশী ও কি কি জিনিস দেখেছে তাই বলুক না ?"

মুকুলের দিকে চাহিয়া পুলক সস্নেহ হাস্যে কহিল, "বলতো মুকুল ! তোমাদের দেশে নতুন জিনিস কি কি দেখেছ ?"

বালক মুকুল এবার উৎসাহিত হইয়া, তাহার কুণ্ঠানত ম্লান দৃষ্টি পুলকের মুখের পানে তুলিয়া ধীর ভাবে কহিল, "আগে বড়

বড় জিনিসগুলোই বলি ?—আচ্ছা প্রথম ধরো সমুদ্দুর—তার পর—"

পুলক বাধা দিয়া হাততালি দিতে দিতে সকৌতুকে বলিয়া উঠিল, "ব্যস্ ব্যস্ ! আর বল্‌তে হবে না,—পৃথিবীতে সমুদ্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর সুন্দর দেখবার জিনিস তো আর কিচ্ছু নেই ! কি যুঁই ? এখন তোমারই হার হ'ল কি না ?"

যুঁই কিন্তু হার মানিবার মেয়ে নয়, সে চোখ মুখ ঘুরাইয়া সগর্ব্বে বলিল, "বারে ! তা' কেন ! আমিও বড় হয়ে সমুদ্দুর দেখব না বুঝি ? নিশ্চয় দেখ্‌ব ! কিন্তু তা ছাড়া আরো কত—"

পুলক মুকুলের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিল, "তা ছাড়া মুকুল আরো কত কি জানে। ধাইমা বল্‌ছিল ও নাকি রবি ঠাকুরের কত ভাল ভাল গান আর কবিতা বল্‌তে পারে—সত্যি মুকুল ?"

মুকুল লজ্জানত বদনে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে পারে—যুঁই তখন যো পাইয়া ধরিয়া বসিল, "পারো তা হলে বল না ! একটা গান বল শুনি।"

মুকুল সলজ্জ ভাবে বলিল, "ভাল পারি না।"

পুলক সাগ্রহে কহিল, "যা পার তাই বল না মুকুল ! এতে লজ্জা করবার তো কিছু নেই।—তা হলে যুঁইও তোমার কাছে কিছু কিছু শিখতে পারে। আচ্ছা চল, ঐ বেঞ্চখানায় আমরা বসি গিয়ে।"

বালক বালিকার হাত ধরিয়া পুলক কাছেই মাধবী কুঞ্জের

ছায়ায় পাতা সবুজ রংয়ের বেঞ্চখানায় উপবেশন করিল, তাহার কাছ ঘেঁসিয়া যুঁই ও মুকুল পাশাপাশি বসিল।

তাহার পর পুলক বলিল, "এইবার শোনাও মুকুল! তুমি কি কি গান জানো।—লজ্জা কি?—আচ্ছা খুব ছোট্ট দেখে একটা বলে ফেলো।"

মুকুল লজ্জারক্ত মুখে খানিক মৌন থাকিয়া পরে বাল-সুলভ মিষ্ট কোমল কণ্ঠে ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিল—

"জীবনে যত পূজা
হল না সারা,
জানি হে জানি তা'ও
হয় নি সারা—
যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরু পথে
হারালো ধারা
জানি হে! জানি তা'ও
হয় নি হারা।"

বিশ্ববরেণ্য মহাকবির সুললিত ভাব ও ছন্দে গ্রথিত সেই মধুময় সঙ্গীতটীতে, জীবনের সমগ্র ব্যর্থতাকে সার্থকতা দান করিবার জন্য যে ব্যগ্র ব্যাকুলতার করুণ উচ্ছ্বাস করুণতর, মধুরতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা ভাবুক পুলকের কবি-হৃদয়খানিকে একান্ত মুগ্ধ, ভাব হিল্লোলিত করিয়া তুলিল।

সে তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল, বালক মুকুল একমনে গাহিতেছে—

"জীবনে আজো যাহা
রয়েছে পিছে—
জানি হে! জানি তা'ও
হয়নি মিছে।
আমার অনাগত
আমার অনাহত
তোমারি বীণা-তারে,
বাজিছে তা'রা
জানি হে! জানি তা'ও
হয়নি হারা।"

গানটী শেষ হইলে পুলক একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বাঃ! চমৎকার গান তো!—এ গান তোমাকে কে শিখিয়েছে মুকুল? বাবা?—মন্ময় তো ঢের গান জানে!"

মুকুল প্রীত হইয়া সগর্ব্বে বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু এ গান আমি আমার মা'র কাছে শিখেছি,—মা এই গানটী গাইতে বড় ভালবাসেন।"

সেইটুকু শুনিয়া পুলকের সমস্ত শরীরের রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। শিরায় শিরায় একটা আনন্দ শিহরণ জাগিল। তবে কি যূথিকা, পুলকের প্রাণের আরাধনার দেবী—যূথিকা, তাহার ব্যর্থ জীবনের অসমাপ্ত পূজার অর্ঘ্য লইয়া, অনাগত অনাহত

উপান্তের আশায় আকুল উন্মুখ আগ্রহে আজও প্রতীক্ষা করিতেছে ?—তবে কি সে—না না,—সমস্তই মিথ্যা,—অলীক কবি কল্পনা মাত্র ! যূথিকা তাহার ঈপ্সিত প্রেমাস্পদের প্রেমে তৃপ্ত হইয়া সুখময় নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিতেছে, নিশ্চয়ই। কিন্তু—মুকুলের গানের সেই প্রথম চরণ দুটী কেবলই ঘুরিয়া ফিরিয়া পুলকের বহু দিনের মরিচা পড়া ছিন্ন ভিন্ন মরম বীণার তারে ঘা দিয়া বাজিতে লাগিল—

"জীবনে যত পূজা
হল না সারা
জানি হে ! জানি তা'ও
হয়নি সারা।"

ওগো পূজারিণী ! ওগো পুলকের সারা জীবনের, যুগ-যুগান্তরের সাধনার ধন ! তোমার এ ভ্রষ্টলগ্ন অসম্পূর্ণ পূজার অর্ঘ্যটুকু পাইবার আশায় সে যে চিরদিন চিরজন্ম—জন্ম জন্মান্তরেও প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সে পাইবে কি ? এ গভীর একনিষ্ঠ প্রেমের তপস্যা তাহার তবে কি একেবারেই নিষ্ফল ব্যর্থ হইয়া যায় নাই দেবী ? একি তবে শুধুই মরীচিকার স্বপ্ন মাত্র নয় ?

পুলককে, স্তব্ধ নীরব থাকিতে দেখিয়া মুকুল ভয়ে ভয়ে ডাকিল, "পিসেমশাই !"

"কি বাবা !" বালকের মৃদু চকিত আহ্বানে পুলক তাহার কল্পলোকে উধাও বিভ্রান্ত মনকে পুনরায় বাস্তব জগতে টানিয়া

আনিল। দেখিল যুঁই কোন্ সময় ফাঁক পাইয়া পলাইয়া গিয়া প্রজাপতি ধরিতেছে, আর মুকুল তাহারই পানে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে বলিতেছে, "এ গান তোমার কি ভাল লাগল না পিসেমশাই ?"

পুলক মুকুলের পিঠ থাবড়াইয়া সস্নেহে কহিল, "না মুকুল এ গান আমার খুব,—খুব ভাল লেগেছে, আর একদিন তোমার সব গানগুলি শুনব।—ওকি যুঁই ! তোমার ও হচ্ছে কি ?"

চঞ্চল প্রজাপতিটীকে অনেকক্ষণ পরে গোলাপের আধ-ফোটা কুঁড়ির উপর স্থির হইতে দেখিয়া যুঁই চুপি চুপি সতর্ক পাদক্ষেপে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, পিতার আহ্বানে সে সচকিত হইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ছোট হাতখানি তুলিয়া ইসারায় জানাইল 'চুপ !'

মুকুল তাহা দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "যুঁইকে আমি এত বলি তবু কিছুতেই শোনে না পিসেমশাই ! কেবল প্রজাপতি আর ফড়িং ধরবে ! অমন সুন্দর আর দুর্ব্বল প্রাণীকে মিছে কষ্ট দেওয়া কি উচিত ?"

সেই সময় "মুকুল ! যুঁই ! তোমরা খাবে এস" বলিতে বলিতে লীলা সেই স্থানে উপস্থিত হইল। স্বামীকে সেথায় অসময়ে অলসভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে বলিল, "তুমিও এখানে ? আমি মনে করেছিলুম ঘরে বসে লিখছ।"

পুলক একটা দীর্ঘ আলস্য ত্যাগ করিয়া বলিল, "আজ যুঁই আমাকে আর লিখতে দিলে না, খেলা দেখতে ডেকে নিয়ে এল।"

"বারে! আমি বুঝি লিখতে দিলুম না? নিজেই তো সেই অবধি খালি বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!"

বলিতে বলিতে যুঁই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিল, আবদারের সুরে বলিল, "আমি এখনি খেতে যাব না বাবা!"

পুলক মেয়েকে আদর করিয়া সস্নেহে কহিল, "কেন? এখনো ক্ষিদে পায়নি বুঝি?"

লীলা রাগত স্বরে বলিল, "একবার খেলায় মাতলে মেয়ের আর ক্ষিদে তেষ্টা কিছু থাকে নাকি? কেবল খেলতেই শিখেছেন! হ্যাঁরে! কাল যে 'লেশ' বোনা ধরিয়েছিলুম সেটা তো দেখছি এখনো যেমনকার তেমনি পড়ে আছে। তা'তে হাত দেবার ফুরসৎ পর্য্যন্ত এখনও হয় নি বুঝি?"

যুঁই পিতার কাছে থাকিলে মাতাকে ভয় করিত না, সে পিতার বুকের ভিতর মুখ গুঁজিয়া নির্ভয়ে বলিয়া দিল, "আমার ওসব ভাল লাগে না।"

"তবে কি ভাল লাগে? খালি ধিঙ্গীপনা করে বেড়াতে?"

পুলক কন্যার পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিল, "ওকে এখন থেকেই ওসব কাজ দাও কেন লিলি? এখনো নেহাত ছেলে মানুষ!—এর পরে ধীরে সুস্থে সব শেখালেই হবে, তা'র এত তাড়াতাড়ি কেন?"

লীলা মুখ ভার করিয়া বলিল, "মেয়েটা শুধু তোমার আদরে আদরেই, গোবর হয়ে যাবে দেখছি!—যাক্ কাজটাজ

কিচ্ছু করে দরকার নেই, এখন খেয়ে চরিতার্থ করবে কি তা'ও নয় ?"

মুকুল পূর্ব্বেই পিসীমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, যুঁইয়ের অবাধ্যতা দেখিয়া সে আর থাকিতে না পারিয়া বলিল, "এস না ভাই যুঁই !—খেয়ে দেয়ে এসে আবার খেলা হবে 'খন।"

পুলক মেয়েকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "যাও মা লক্ষ্মীটী ! বেলা হয়ে যাচ্ছে শীগ্‌গীর করে খেয়ে এস গে।"

"কিন্তু তুমি এইখানেই বসে থেকো।" বলিয়া ক্ষুণ্ণমনে যুঁই মুকুলের সহিত আহার করিতে গেল।

সুযোগ পাইয়া পুলক আবার নিভৃতে তাহার কল্পনা দুয়ার মুক্ত করিয়া দুরাশার জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

দশ

পরদিন লেখাপড়া সংক্রান্ত একটা জরুরী কাজে পুলককে কলিকাতায় যাইতে হইল। বৈকালে ফিরিবার কথা, কিন্তু কার্য্যগতিকে ট্রেণ 'মিস্' করিয়া পুলক যখন দ্বিতীয় ট্রেণ ধরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় পুলক একমাত্র আরোহী। আসন্ন রজনীর ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে যাত্রীপূর্ণ দীর্ঘ ট্রেণখানি যেন কোন অনির্দ্দেশ দীর্ঘযাত্রার জন্য অবিরাম গম্ গম্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

দুই পার্শ্বের বহিঃপ্রকৃতির ছায়াময় চলন্ত দৃশ্যগুলি যেন কোন্ অদৃষ্ট দুজ্ঞে য় রহস্যময় প্রেতলোকের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। নক্ষত্রভরা গাঢ় নীল স্তব্ধ আকাশের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সারাদিন কর্ম্মের ব্যস্ততা ও গণ্ডগোলের মধ্যে যে চিন্তা সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে নিঃসঙ্গ একাকী পাইয়া সেই বিস্মৃত চিন্তা পুলককে আবার পাইয়া বসিল।

তাহার মনে তখন আপনা আপনি প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। —আচ্ছা, মুকুল সে চিঠিখানা প্রথমে তাহাকেই দেখাইতে আসিল কেন? তাহার পিসীর দ্বারায় কি পড়াইয়া লইতে পারিত না? আর সেই গান—সেকি সত্যই যূথিকার প্রাণের

কথা ?—না না, কি জ্বালা !—গান তো লোকে কতই গায় ।—কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া মুকুল তাহার কাছে যূথিকার সেই প্রিয় গানটীই গাহিল কেন ? সে কি বুঝিয়াছে তাহার মাকে পুলক মনে মনে ভালবাসে ?—তাহার প্রিয় প্রসঙ্গটুকু পুলককে প্রকৃতই আনন্দ দান করে ?—শিশু হৃদয় কি সত্যই অন্তর্য্যামী ?

পরক্ষণেই মনে পড়িল যূথিকার চিঠির কথা. সে ছেলেকে লিখিয়াছে, "তুমি ওখানে গিয়ে বেশ সুখে, মনের আনন্দে আছ তো ?" প্রাণের ভিতর কতখানি আশা কতখানি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া অপত্যস্নেহে মুগ্ধা বিচ্ছেদকাতরা জননী তাহার স্নেহক্রোড় হইতে নির্ব্বাসিত অসহায় শিশু সন্তানটীকে এই প্রশ্ন করিয়াছে। কিন্তু বালক মুকুল বাস্তবিকই সুখে ও মনের আনন্দে আছে কি ? তবে সে যে সর্ব্বক্ষণ এমন উদাস ও স্ফূর্ত্তিহীন থাকে, স্বাস্থ্যহীনতাই তাহার একমাত্র কারণ, না আরও কিছু ? অনেক ভাবিয়াও পুলক কিছু নির্ণয় করিতে পারিল না।

সে যখন ঘরে পঁহুছিল, তখন বেশ একটু রাত হইয়া গিয়াছে। দিনের কোলাহলপূর্ণ বাটীখানি এখন একান্ত নিস্তব্ধ। পুলক শয়ন কক্ষে গিয়া দেখিল লীলা তাহারই অপেক্ষায় জাগিয়া থাকিয়া বাতির উজ্জ্বল আলোকে রুমালে ফুল তুলিতেছে।

স্বামীকে দেখিয়া সে সূচিকর্ম্ম রাখিয়া দিয়া বলিল, "দুপুরের গাড়ী ধরতে পারোনি বুঝি ?"

পুলক বলিল, "হ্যাঁ, কাজের ভিড়ে সময় পাইনি। বাড়ী যে এরি মধ্যে নিস্তব্ধ ?—ছেলেরা ঘুমিয়েছে বুঝি ?"

লীলা সহাস্যে কহিল, "কে যুঁই ?—দায় পড়েছে তা'র ঘুমোতে ! এই যে তখন থেকে গল্প গল্প করে আমার মাথা খেয়ে এখন 'মট্‌কা' মেরে শুয়ে থাকা হয়েছে যেন কত ঘুমই ঘুমোচ্ছে—"

মায়ের কাছে ধমক খাইয়া যুঁই বাস্তবিক নিদ্রার ভাণ করিয়া চুপ চাপ বিছানায় পড়িয়াছিল, এখন সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে তড়াক্ করিয়া উঠিয়া বসিল।

পুলক তাহাকে আদর করিয়া বলিল, "দুষ্টু মেয়ে ! তোমার চক্ষে এখনো ঘুম নেই ?"

পিতার গলা জড়াইয়া আদরিণী যুঁই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার জন্যে কি এনেছ বাবা ?"

"এই যে কত জিনিষ এনেছি দেখ।"

পুলক তাহার গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ খুলিয়া কলিকাতা হইতে আনীত দ্রব্যাদি একে একে বাহির করিতে লাগিল। কত পুতুল, বাঁশী, কাঁচের খেলনা দেখিয়া যুঁই অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিল, "বারে ! এ যে অনেক জিনিষ এনেছ বাবা ! আর মুকুলের জন্যে কিছু আনোনি ?"

"এনেছি বৈকি !" একটা খেলার পিস্তল ও একখানি সুন্দর ছবির বহি বাহির করিয়া পুলক বলিল, "যাই এগুলো মুকুলকে দিয়ে আসি।"

লীলা বলিল, "সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণ,—এখন থাক্ না সকালে উঠ্‌লে দিও। তুমি কাপড় চোপড় ছেড়ে খাবে চল।"

কিন্তু পুলক স্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিল না। আজ কি জানি কেন ঐ ছেলেটীকে দেখিবার জন্য তাহার মন সারাক্ষণই চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। "একবারটী দেখেই আসি?" বলিয়া পুলক মুকুলের জন্য আনীত উপহার দ্রব্য তুলিয়া লইয়া তাহার ঘরে চলিল।

মুকুল তখন প্রকৃতই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পার্শ্বে বসিয়া ধাত্রী সারদা সুপ্ত বালকের মুখের দিকে চাহিয়া কি জানি কি ভাবিতেছিল।

পেটের দায়ে দাসীবৃত্তি করিলেও সারদা ছিল ভদ্র গৃহস্থের কন্যা। অল্প বয়সে বিধবা হইয়া সে যখন মুকুলের মাতামহের আশ্রয়ে আসে, তখন মুকুলের মাতা যূথিকাও জন্মগ্রহণ করে নাই। এই সুদীর্ঘকাল একই সংসারে একত্র বসবাস করায় সে পরিবারের লোকগুলির প্রতি সারদার যথার্থ আত্মীয়ের মত একটা অকপট মায়ামমতা বসিয়া গিয়াছিল। মুকুলকে সে বড় ভালবাসিত।

পুলককে দেখিয়া সারদা বলিল, "এই যে এসে গেছ বাবা? মুকুল আজ সারাদিন কেবল তোমার কথাই জিজ্ঞেসা করেছে। তোমার অপেক্ষায় এতক্ষণ জেগে থেকে এই সবে ঘুমিয়েছে।"

আশ্চর্য্য ! মুকুলও তাহার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছে ? তবে আকর্ষণটা শুধু পুলকের একার দিক হইতেই নহে।

পুলক উপহার দ্রব্য সারদার হাতে দিয়া বলিল, "এগুলো রেখে দাও, সকালে মুকুলের ঘুম ভাঙ্গলেই দিও। দিনের গাড়ী ধরতে পারিনি তাই ফিরতে রাত হয়ে গেল।"

কিন্তু মুকুলকে নিদ্রিত দেখিয়াও পুলক সহসা ফিরিতে পারিল না। সে মুকুলের শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত সেই সুখসুপ্ত বালকের ধীর স্থির প্রশান্ত মুখচ্ছবি নিষ্পলক-নেত্রে দেখিতে লাগিল, তাহার পর একটুখানি আদর করিয়া যাইবার ইচ্ছায় পুলক স্নেহভরে অবনত হইয়া তাহার ঘুমন্ত মুখখানি চুম্বন করিতেই মুকুল গাঢ় সুষুপ্তির ঘোরেও নিদ্রা শিথিল বাহু দিয়া পুলকের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তন্দ্রাজড়িত অস্ফুট কণ্ঠে, মমতা মথিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "আবার সকালে এসে আদর করো, —কেমন ?"

নিদ্রিত বালকের এই কথার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে না পারিয়া পুলক উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সারদার দিকে চাহিল। সারদা একটু করুণ হাসি হাসিয়া বলিল, "আহা! বাবা, মুকুল তোমাকে ওর মা মনে করেছে ! ওর মা তো ওকে একদণ্ড কাছছাড়া করতে চাইত না, কি করে বেচারী, স্বোয়ামীর কথায় বাধ্য হয়ে ছেলেকে ন্যর্সের কাছে শোওয়াতেই হ'ত। জামাই ছেলের দিকে বেশী ঘেঁস দেওয়াটা পছন্দ করেন না কিনা ! কিন্তু তবু মুকুল যতক্ষণ জেগে থাকৃত সে ওর কাছ থেকে নড়ত না, ঘুমিয়ে পড়লে

ছেলেকে আদর করে চুমো খেয়ে তবে সে যেতো। সেই সময় ঘুমের ঘোরে মুকুল তা'র মা'কে রোজ ঐ কথাটী বল্‌ত, ওটা ওর চিরদিনের অভ্যেস।"

পুলকের অন্তর কাঁপাইয়া একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল। হায় রে! মাতৃস্নেহ-সর্ব্বস্ব অবোধ শিশু! মাতা পুত্রের সেই মমতাময় করুণ কাহিনী আর একটুকু শুনিবার আগ্রহে পুলক বহুবার শ্রুত কথাটা আজ আবার পাড়িল, সে বলিল, "মুকুলের মা ওকে বড্ড ভালবাসে, না মাই মা?"

"তা আর বলতে বাবা?—তা'র ধ্যান, জ্ঞান সর্ব্বস্বই যে ঐ মুকুল, ঐ ছেলেটীকে নিয়েই যে সে সর্ব্বক্ষণ কাটাতো, সেজন্য সময় সময় জামাইয়ের কাছে কত বকুনীও খেয়েছে। আহা! সেই মুকুলকে আজ এত দূরে এই সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে পাঠিয়ে দিয়ে মেয়েটার যে কি দশা হয়েছে, কে জানে?—কি করে বল, প্রাণের দায়ে পাঠিয়ে দিতে হ'ল। ডাক্তাররা সবাই বল্লেন কিনা, হাওয়া বদল ছাড়া ছেলেকে বাঁচাবার আর কোনও উপায় নেই, নইলে সেকি সহজে চোখের আবডাল করত? আহা গো! ছেলেটাকে পাঠাবার তিন দিন আগে থাকতে, বাছা যে আমার আহার নিদ্রে সব ত্যাগ করে বসেছিল!—তা'র মন যে ফুলের চেয়েও নরম—এত দুঃখ সে কি করে সইবে বাবা?" বলিতে বলিতে সারদার কণ্ঠস্বর জড়িত ও আর্দ্র হইয়া উঠিল। ব্যথিত উচ্ছ্বসিত চিন্তাবেগ সম্বরণ করিয়া পুলক ধীরে ধীরে তাহার শয়ন কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

দেখিল যুঁই তাহার নূতন খেলনাগুলি শিয়রে সাজাইয়া একটী বড় পুতুল বুকে রাখিয়া অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। লীলা সানুযোগে কহিল, "কি করছিলে এতক্ষণ? শীগ্‌গির করে খেয়েদেয়ে নাও, রাত তো বড় কম হয় নি।"

অন্যমনস্কে কাপড় ছাড়িয়া, মুখ হাত ধুইয়া পুলক যখন আহারে বসিল, তখনও তাহার মন প্রকৃতিস্থ হয় নাই। কেবল মনে পড়িতেছিল এই সুদূর বিচ্ছিন্ন কোমল প্রাণ মাতা ও পুত্রের কথা।

কল্পনা দৃষ্টি সুদূরে প্রসারিত করিয়া দিয়া পুলক যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল—একখানি তনয়বিরহবিধুর স্নেহাকুল তৃষিত মাতৃ-হৃদয় কেমন দূরদূরান্তরে দুস্তর সাগর পার হইতে, কি দুর্ণিবার অধীর আগ্রহে, তাহার বুকজোড়া ধন, অঞ্চলের নিধিটীর পানে নিরন্তর উন্মুখ হইয়া আছে!

সেই উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল বিপুল জলধির দুর্লঙ্ঘ্য সুদূর ব্যবধান অতিক্রম করিয়া দুটী মমতা মথিত আকুল নয়নের সজল আর্ত্ত কল্যাণবর্ষী দৃষ্টি—কি গভীর স্নেহে, কি প্রগাঢ় ব্যাকুলতায় তাহার আদরের দুলাল, নয়নের মণিটীর দিকে অবিরত নিষ্পলকে চাহিয়া আছে!

হায়! একি বিচিত্র, মধুর, সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্বভোলা মাতৃস্নেহ!

স্বামীর অন্যমনস্কতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া লীলা তাহার পাশে বসিয়া আজিকার একটী নূতন ঘটনার বিষয় গল্প করিতেছিল। বিষয়টা এই—

স্থানীয় ডেপুটী অনিলবাবুর গৃহে তাঁহার কন্যার 'সাধ' উপলক্ষ্যে অদ্য মহিলাগণের ভোজ ছিল।

সেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া অতর্কিত অভাবিতরূপে সাক্ষাৎ ঘটিল লীলার বাল্যসঙ্গিনী পুষ্পরেণুর সহিত।

রেণুর স্বামী মুঙ্গেরে মুন্সেফ ছিলেন, সম্প্রতি এখানে বদলী হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে নবাগত মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী যে লীলার বাল্যসখী পুষ্পরেণু,—তাহা সে এত দিনেও জানিতে পারে নাই।

আরও আশ্চর্য্যের কথা, লীলা চিনিতে না পারিলেও রেণু তাহাকে প্রথম দর্শনেই কেমন অসংশয়ে চিনিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর বড় লোকের গৃহিণী হইলে কি হয়, রেণু এখনও সেই ছোট্ট রেণুটীই আছে! তেমনি সরল, তেমনি আমুদে! স্বভাবে অহঙ্কারের লেশ মাত্র নাই!

লীলার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই রেণু তাহার সখীকে পুলকের মত একজন স্বনামধন্য বিখ্যাত সাহিত্যিকের স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্যের জন্য সানন্দে সগৌরবে অভিনন্দিত করিয়াছিল। বলিয়াছিল, "কি স্বামীই তুই পেয়েছিস লিলি!—সার্থক তোর জীবন, ধন্য তোর নারী-জন্ম!"

সখীর অতিরিক্ত প্রশংসা ও আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে ব্যতিব্যস্ত হইয়া লীলা যখন তাহাকে বাধা দিবার জন্য কহিল, "ইঃ!—তুই যে একেবারে আকাশে তুল্লি ভাই!—দু চার খানা

বই লিখে উনি কি এমন একটা কেষ্ট বিষ্ণু হয়ে উঠেছেন যার এত প্রশংসা ?”

তখন রেণু বিস্মিত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, “কি যে বলিস ভাই, —পুলক বাবুর লেখার প্রশংসায় যে দেশ বিদেশ ছেয়ে গেছে ! তুই বল্‌লেই তো হবে না ? সত্যি ভাই ! মানুষ একটা দিকেই মন দিতে পারে, কিন্তু এ যে সকল দিকেই সমান অধিকার ! আজকাল দেখি প্রবন্ধও খুব লিখ্‌তে আরম্ভ করেছেন। একেই বলে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ! আচ্ছা লিলি ! উনি এক সঙ্গে এত রকম লেখেন কি করে ভাই ? তুইও কিছু লিখেছিস্ নাকি ?”

লীলা হাসিয়া উত্তর দিল, “না ভাই ! আমার ঘটে ওসব কবিত্ব টবিত্ব কিছুই আসে না,—ভালও লাগে না তেমন। আমি বোধ হয় ওঁর সমস্ত লেখাগুলো আজও পড়ে উঠ্‌তে পারিনি।”

লীলার এই সহজ ও সরল কথায় হাকিম গৃহিণী রেণু বিস্ময়ের আতিশয্যে কিরূপ অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, এই অনায়াসলভ্য সুযোগটুকু হেলায় হারাণোর জন্য তাহাকে কত মিষ্ট অনুযোগ করিয়াছিল, এবং পুলকের মত একজন যশস্বী ও বিশিষ্ট লেখকের সহিত লীলার মত একটী অতি সাধারণ সামান্যা নারীর বিচিত্র সংযোগকে সে বাঁদরের গলায় মুক্তার মালার সহিত উপমা দিয়া কত না উপহাস কত না হাসাহাসি করিয়াছিল। সেই সব কৌতুক কাহিনী লীলা উন্মনা স্বামীর সাক্ষাতে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল।

মধ্যে মধ্যে 'হ্যাঁ' 'হুঁ' 'আচ্ছা!' বলিয়া সায় দিয়া গেলেও কথাগুলো যে সমস্ত শ্রোতার কাণেও যায় নাই, তাহা মুখ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল। কিন্তু লীলার সে দিকে দৃক্‌পাতও ছিল না।

এক সময় স্ত্রীর গল্পে বাধা দিয়া পুলক সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল, "আচ্ছা—এরা বেশ ভাল আছে তো?"

স্বামীর এই অসাময়িক অদ্ভুত প্রশ্নে লীলা কিছু চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কা'র কথা বলছ? যুঁইর? সে তো বেশ ভালই আছে, এইতো তোমার সুমুখেই পুতুল নিয়ে খেল্‌তে খেল্‌তে ঘুমিয়ে পড়ল।"

পুলক কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না না, আমি মুকুলের কথাই জিজ্ঞাসা করছি। এখানে এসে তা'র শরীর আর মনের প্রতি তুমি কি রকম দেখছ? সারদা বলছিল অত ছোট্ট ছেলেটীকে তা'র মা'র কাছ-ছাড়া করে এই সাত সমুদ্দুর পারে পাঠিয়ে দেওয়া নাকি ঠিক হয়নি।"

লীলা ঘাড় নাড়িয়া পরম বিজ্ঞের মত বলিল, "ঠিক উল্টো! আমি তো বলি মুকুলের মা'র কাছ ছাড়া হয়ে এই সাত সমুদ্দুর পারে আসাটা একটুও বেঠিক্ হয় নি. বরং তা'র শরীর আর মনের পক্ষেও খুব ভালই হয়েছে। সে এখন খুব শীগ্‌গির সেরে উঠবে, তুমি দেখো। এ বয়সে অমন মা নেজুড়ে হয়ে থাক্‌লে কি ছেলেরা কখনো উন্নতি করতে পারে? আর নেহাত মাই খোকো ছেলেটী তো নয়? অমনি ভাবে

পুতু পুতু করে রেখেই তো বৌদি ছেলেটার দফা সেরে দিয়েছে। ঐ নিয়ে নাকি মধ্যে মধ্যে দাদার সঙ্গেও ঝগড়া হয়ে যায়। সত্যিই তো!—ছেলেকে অমন ঘ্যান ঘ্যানে প্যান প্যানে করে রাখা—”

পত্নীর দীর্ঘ বক্তৃতায় বাধা দিয়া পুলক বলিল, “কিন্তু মুকুল ছেলেটাকে আমার তো বেশ ভালই লাগে। অবশ্য শরীরের দিক থেকে বলছি না, তবে বুদ্ধি সুদ্ধি তা'র বয়সের চেয়ে ঢের বেশীই আছে বোধ হয়।”

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া লীলা বলিল, “না বাপু! যে বয়সের যা তাই ভাল লাগে। ছেলে মানুষ,—কোথায় লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে খেলবে, দিনে দশবার খাবে, দুম্ দাম করে কাজ করবে—তা না, খালি মুখ গোম্সা করে গোঁজ্ হয়ে থাক্‌বে! ছেলের মুখে বেশী কথাও তো কোনও দিন শুনলুম না। অবিশ্যি শান্ত ধীর হওয়াটা আমি মন্দ বলি না, কিন্তু এই ছেলে বয়সে অমন বুড়োটে ভাব আমি দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না।”

পুলক আর কিছু বলিল না। দম্পতীর মধ্যে মুকুলের প্রসঙ্গ সেদিন এইখানেই মুলতুবী রহিল।

এগারো

রাত্রি গভীর হইয়াছিল। লীলা শয্যা গ্রহণ করিতে না করিতে অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু পুলকের চক্ষে আজ নিদ্রা দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল।

একে তো কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ক্রমাগত ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে পুলকের মনের অবস্থা বেশ স্বচ্ছন্দ ও সহজ ছিল না, তাহার উপর এখন আবার ধাত্রী সারদা ও লীলা দুইজনের দুই বিরুদ্ধ মনের অভিব্যক্তি দুইদিক হইতে গঙ্গা যমুনার ধারার মত প্রবল বেগে আসিয়া তাহার অপ্রকৃতিস্থ অসুস্থ চিত্তকে আরও সংক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। দুইটী বিপরীতমুখী ভাবের প্রেরণায় দিশাহারা হইয়া পুলক তখন ভাবিতেছিল কাহার ধারণা অভ্রান্ত? সারদার, না লীলার?

কিন্তু এ যে বড় জটিল সমস্যা! কিছুতেই তাহার মীমাংসা করিতে না পারিয়া পুলকের চিন্তাশ্রান্ত মস্তিষ্ক ক্রমে উষ্ণ হইয়া উঠিল, তন্দ্রালেশহীন চক্ষুদুটী জ্বালা করিতে লাগিল।

বদ্ধ ঘরের রুদ্ধ বায়ু সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে বহির্গত হইয়া তাহার লাইব্রেরী সংলগ্ন উদ্যানটীতে উপনীত হইল। যেখানটীতে কাল মুকুলের সহিত তাহার প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল, সেইখানে সেই বেঞ্চের উপর এলাইয়া পড়িয়া পুলক শান্তিময়ী নৈশ প্রকৃতির স্তব্ধ নিথর

শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার চিন্তাভারাকুল অশান্ত মনখানিকে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা পাইল।

কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি, আকাশে চাঁদ ছিল না। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই, আলো ও অন্ধকার, কবির ভাবমুগ্ধ দৃষ্টিতে উভয়ই সমান। সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি, সকল সময় সকল অবস্থাতেই তাহার চক্ষে সমান মনোহারিণী!

দিনে কিম্বা রাত্রে, যখনই কোনও জটিল চিন্তা বা গভীর ভাবাধিক্যে পুলক শ্রান্ত হইয়া পড়িত, তখনই তাহার এই অতি প্রিয় নিভৃত স্থানটীতে ছুটিয়া আসিত, আসিয়া প্রকৃতই বড় শান্তিলাভ করিত।

আজও চন্দ্রহীনা শব্দহীনা তামসী নিশীথিনী তাহার অনলস অতন্দ্র সহস্র নিযুত তারকা চক্ষু মেলিয়া মমতাবর্ষী নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে শান্তি প্রয়াসী পুলকের পানে চাহিয়া রহিল।

উদ্যানের অগণ্য প্রস্ফুটিত নৈশকুসুমগুলির সুমধুর ঘন মিশ্র সুরভিরাশি—সমবেদনার, গাঢ় নিশ্বাসের মত, পুলকের শান্তিহারা বিক্ষুব্ধ চিত্তে, সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপের মত চারিদিক হইতে ঘেরিয়া রহিল।

চির-স্নেহময়ী প্রকৃতি জননীর সেই নিভৃত শান্তি, নীরব সান্ত্বনায় অভিষিক্ত হইয়া পুলকের চিন্তাপীড়িত অবসাদ-গ্রস্ত দেহ মন যেন স্নিগ্ধতায় জুড়াইয়া গেল।

চারিদিক্‌কার বিক্ষিপ্ত চিন্তাজাল গুটাইয়া লইয়া পুলক তখন বালক মুকুলের প্রতি তাহার এখনকার কর্ত্তব্য

নিরূপণ করিতে বসিল। এই নিষ্ঠুর রোগের দাহনে বিশুষ্ক কোমল মুকুলটীকে পুনর্ব্বার সজীবতা দান করিতে হইলে শুধু ঔষধ পথ্য ও জলবায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা দিলে তো চলিবে না,—সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনকেও একটা খোরাক দেওয়া চাই, সেটুকু পুলক দিতে পারিবে না কি ?

পুলকের মনে পড়িল এই কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বের ঘটনা, বালক মুকুল, কি অকুণ্ঠিত সরল চিত্তে, কি নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সহিত তাহার কাছে আদর ভিক্ষা করিয়াছিল, অবশ্য সেটুকু নিদ্রাঘোরে পুলককে মাতৃজ্ঞানেই করিয়াছিল, কিন্তু সে মনে করিলে কি মাতৃস্নেহে বঞ্চিত সরল শিশুর এই অভাবটুকু পূর্ণ করিতে পারিবে না ? তাহার সারা জীবনের আকাঙ্ক্ষার ধন—যূথিকার হৃদয়নিধি এই মুকুল—তাহাকে মায়ের মত আদর মমতা ও স্নেহময় সঙ্গ দিয়া সে পুনরায় সবল সঞ্জীবিত করিতে পারিবে না কি ? কেন পারিবে না ? নিশ্চয় পারিবে। এতদিন তবে কি সে বৃথাই মনস্তত্ত্বের আলোচনায় মাথা ঘামাইয়াছে ? মনে মনে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়া পুলক অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগ সুস্থচিত্তে শয়ন করিতে গেল।

বারো

সেই দিন হইতে সাহিত্য চর্চ্চার অবকাশ সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়া পুলক মুকুলের সহিত পরিচয়টা আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া লইতে প্রয়াস পাইল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সে বুঝিতে পারিল এই গম্ভীর শান্ত প্রকৃতি বালকের চরিত্রে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণত্ব আছে, যাহা সচরাচর বালকদিগের মধ্যে দেখা যায় না।

পুলক দিনের পর দিন মুকুলকে যতই তলাইয়া দেখিতে লাগিল, ততই তাহার অসামান্য প্রতিভা, তীক্ষ্ণ ধী ও আশ্চর্য্য পর্য্যবেক্ষণ শক্তি দেখিয়া সে পুলকিত চমৎকৃত হইয়া গেল। সুকুমারমতি বালকের প্রতিভাময় অস্ফুট মনোবৃত্তিগুলি ফুটাইয়া তুলিতে তাহার আগ্রহ ও উৎসাহ ততই জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

পুলকের এখন দিনের অধিকাংশ সময় ছেলেদের লইয়াই কাটে, বালক বালিকা ছুটীর খেলা ধূলা ও বিশ্রামের নিত্য সঙ্গী হইয়া নানাপ্রকারে তাহাদিগকে আমোদ ও সৎশিক্ষা দান করিতে থাকে।

পুলকের এই পরিবর্ত্তনে পিতাকে সদা সর্ব্বদা কাছে কাছে পাইবে ভাবিয়া যুঁই প্রথমটা বড়ই খুসী হইয়াছিল, কিন্তু যখন সে বুঝিতে পারিল পিতার এই পরিবর্ত্তন শুধু

তাহারই জন্য নহে, মুকুলকে অবিচ্ছিন্ন সাহচর্য্য দেওয়াই তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য, তখন বালিকা কিছু মুসড়াইয়া পড়িল।

যুঁইর সহিত মুকুলও এখন পুলকের ঘরে অবাধ প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। পুলকের সাহিত্য আলোচনার সময় যখন যুঁই কিছুতেই আর নীরব সুস্থির থাকিতে না পারিয়া পুতুলের বাক্স লইয়া খেলা জুড়িয়া দিত, তখন মুকুল সন্তর্পণে আসিয়া পুলকের কাছ ঘেঁসিয়া বসিত, এবং পিসেমহাশয়ের লেখার বিষয় বুঝিতে না পারিলেও সে পরম মনোযোগ ও ধৈর্য্যের সহিত চুপটী করিয়া দেখিতে থাকিত।

বালকের এই সাহিত্যানুরাগ ও জ্ঞানানুশীলনের আগ্রহ দেখিয়া পুলক সময় সময় হাতের কাজ স্থগিত রাখিয়া বই হইতে বাছিয়া বাছিয়া ছোট ছোট সুপাঠ্য গল্প কবিতা এবং প্রবন্ধ তাহাকে পড়িয়া শুনাইত।

বালক মুকুল সেই সকল গভীর ভাবপূর্ণ রচনার মর্ম্মার্থ, এত শীঘ্র ও এমন সহজে বুঝিয়া লইত এবং সেগুলির ভাল মন্দ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানীর মত এমন সব সমুচিত মন্তব্য প্রকাশ করিত, যাহা পুলককে বড় আশ্চর্য্য ও আনন্দিত করিয়া তুলিত।

লীলা এখন প্রায়ই দেখিতে পায়, পুলক তাহার লেখার খাতা ফেলিয়া রাখিয়া মুকুলকে বই পড়িয়া শুনাইতেছে, কিম্বা নিশ্চিন্তমনে বেশ গল্প জমাইয়া তুলিয়াছে। দেখিয়া

প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিত না। ঐ তো একটা রোগা পট্‌কা, জড়দগব ছেলে তা'র জন্য আবার এত কেনরে বাপু?—বাপের বোন্‌ পিসী, সে—তার চেয়ে দরদ হ'ল কি না পিসের—যার সঙ্গে রক্তের কোনও সম্পর্ক নাই! মায়ের মনের এই বিরোধের ভাবটুকু ক্রমে মেয়ের মনেও সংক্রামিত হইয়া উঠিল।

এতদিন পিতার উপরে যুঁইর পূর্ণ একাধিপত্য ছিল। সে অধিকারে মুকুলকে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া তাহার মুকুলের উপর যেটুকু সহানুভূতি ও প্রীতির ভাব ছিল তাহাও ক্রমে অন্তর্হিত হইল।

সে এখন মুকুলকে পিতার সান্নিধ্য হইতে তফাৎ রাখিবার জন্য সতর্ক প্রহরীর মত সর্ব্বদা আগলাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু কিছুতেই মুকুলকে পিতার সঙ্গচ্যুত করিতে পারিল না। মুকুল ছায়ার মত সর্ব্বক্ষণ পুলকের কাছে কাছে থাকে,—থাকিতে ভালবাসে।

পিসীর দিকে বড় একটা ঘেঁস দিতে যায় না। যুঁইর সঙ্গে খেলিতেও তাহার আর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না; ক্ষুদ্র বালক, বোধ হয় বুঝিয়াছিল এই অপরিচিত পরিবারে একমাত্র পুলকই তাহার আপনার জন।

পুলকের আন্তরিক যত্ন ও সস্নেহ সদয় আচরণে মুকুলের রোগজীর্ণ দুর্ব্বল শরীরের অবসাদ দূর হইয়া ক্রমশঃ স্বাস্থ্যের

লক্ষণ দেখা গেল। মনের সঙ্কোচ ও বিষণ্ণভাব কাটিয়া গিয়া ধীরে ধীরে উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তির বিকাশ আরম্ভ হইল।

বালকের এই পরিবর্ত্তন পুলককে আনন্দিত ও আশান্বিত করিয়া তুলিল। কিন্তু মুকুলের উৎসাহ স্ফূর্ত্তি সমস্তই তাহার পিসীর সম্মুখে গেলে নিমেষে নিভিয়া যাইত। তাই সে পিসীমার সঙ্গটুকু সাধ্যমত পরিহার করিয়া চলিত।

কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি লীলার যে বাস্তবিক স্নেহ বা যত্নের অভাব ছিল, তাহা নহে।

ক্ষুধা না থাকিলেও পেট-ঠাসিয়া খাওয়াইয়া, ইচ্ছা না থাকিলেও জোর করিয়া বেড়াইতে পাঠাইয়া দিয়া, সদা সর্ব্বদা ছোট বড় ফাই ফরমাস খাটাইয়া লীলা সেই 'জড়ভরত' ছেলেটার অভ্যাস নিয়মিত এবং শরীর মজবুত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইত।

তাহার বিশ্বাস ছিল, পেট ভরিয়া খাওয়া, আর দুম্ দাম্ করিয়া কাজ করা, এই দুইটি হইল ছেলেদের শরীর সবল সুস্থ রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

এই উপায়গুলি মুকুলের দুর্ব্বল দেহের উপর কিরূপ কাজ করিতেছিল বলা যায় না, কিন্তু বালকের কোমল মনের পক্ষে তাহা মোটেই অনুকূল ছিল না। পিসীমার এই যত্নটুকুর ভয়ে, মুকুলকে আরও সশঙ্কিত থাকিতে হইত। তাঁহার কোনও কথায় 'না' বলিবার সাহস বা স্বাধীনতাও সে বেচারির ছিল না।

সবচেয়ে দুঃসহ ও শঙ্কটের সময় ছিল, দুপুর বেলাটা,—যখন লীলা মুকুল ও যুঁই দুজনকেই পক্ক আম্র ও দুগ্ধ সংযোগে আকণ্ঠ অন্নাহার করাইয়া, বৈশাখের প্রখর রৌদ্র ও গ্রীষ্ম হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহাদের ঘরের ভিতর বন্দী করিয়া রাখিত।

মায়ের কড়া শাসনে বাধ্য হইয়া যুঁইকেও মুকুলের মত শুইয়া পড়িতে হইত, কিন্তু সে বেশীক্ষণ চুপ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিত না। বার কতক এপাশ ওপাশ করিয়া বার দুই হাই তুলিয়া সে শীঘ্রই আবার গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িত। মাতা ধমক দিলে বলিত "কি করব বল? ঘুম যে কিছুতে আসে না!"

কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি ছিল না, "ঘুম আসছে না, ঘুমিও না,—তাই বলে এই দুপুর রোদে মাতামাতি করে বেড়াতে হবে নাকি?" বলিয়া লীলা একটা কিছু বোনা বা সেলাই হাতে দিয়া মেয়েকে আটক করিয়া রাখিত।

মুকুল দায়ে পড়িয়া ঘুমের ভাণ করিয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকিত। আর মাঝে মাঝে চোখ পিটুপিটু করিয়া দেখিত। যুঁই "ওমা গো! আর যে পারি না! বাগানে এখন রোদ কোথায় বলতো?—কি সুন্দর ছাওয়া, কেমন ঠাণ্ডা সেখানে—তোমার এ বদ্ধ ঘরের চেয়ে সেখানে গরম ঢের কম—" বলিয়া এক এক বার বিদ্রোহ প্রকাশ করিবার উপক্রম করিতেছে। কিন্তু লীলা সমস্তই অগ্রাহ্য করিয়া একমনে

সেলাইয়ের মেসিনের চাকাটা খট্ খট্ করিয়া দ্রুত ঘুরাইয়া চলিয়াছে।

মুকুলের মনখানি সেই সময়টীতে তাহার স্নেহময় পিসে মহাশয়কে নিভৃতে পাইবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে প্রলুব্ধ হইয়া উঠিলেও পিসীমার শাসন ও অসন্তুষ্টির ভয়ে সে ঘরের বাহিরে পা বাড়াইতে পারিত না।

কয়েক ঘণ্টা সে অকষ্ট বন্ধনে থাকিয়া বৈকালের দিকে যখন মুক্তিলাভ করিত, তখন যুঁইর সঙ্গ অপরিহার্য্য।

তেরো

সকাল সাতটা হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত পুলক তাহার নির্জ্জন কক্ষে পড়াশোনা করিত। সে সময় যুঁই ও মুকুল ছায়া শীতল উদ্যানের এক প্রান্তে থাকিয়া খেলা-ধূলা করিত। পুলকের ইহাই আদেশ ছিল।

মধ্যে মধ্যে লেখাপড়া ছাড়িয়া পুলক নিজেও বালক-বালিকার খেলায় যোগ দিত। কখনও বা বাতায়নে দাঁড়াইয়া নীরবে তাহাদের খেলা দেখিত।

সেদিন সকাল হইতেই বাগানের দিকে ছেলেদের সাড়া শব্দ ছিল না। পুলক একমনে অনেকক্ষণ লিখিতে লিখিতে এক সময় নিত্যকার অভ্যাস মত জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেদিকে যুঁই বা মুকুলের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। তাহাদের খোঁজে পুলক উদ্যানের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রদক্ষিণ করিল, যেখানে যেখানে এ সময় তাহাদের থাকা সম্ভব, সেখানে সেখানে দেখিয়া আসিল। তাহার পর মুকুলের ঘরে গিয়া দেখিল তাহারা সেখানেও নাই। সারদা ঘরে একাকিনী বসিয়া মুকুলের জামায় বোতাম বসাইতেছিল, পুলক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এরা গেল কোথায় ধাই মা? মুকুল আর যুঁই? তা'রা যে রোজ এ সময় বাগানে খেলা করে, আজ তো দেখছি না।"

"হ্যাঁ বাবা! রোজ তো তাই করতো, কিন্তু—" সারদা একটু ইতস্ততঃ করিয়া জানাইল বাগানে ছেলেরা গোলমাল করিয়া নাকি বাবুর পড়াশোনার ব্যাঘাত করিয়া থাকে,—তাই কর্ত্রীর হুকুমে আজ হইতে তাহাদের খেলার স্থান স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শুনিয়া পুলক কিছু বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইল। ছেলেরা যে তাহার কাজে বিঘ্ন প্রদান করে, তাহা সে তো কোনও দিন লীলাকে আভাসেও জানায় নাই, তবে আজ আবার এই নূতন ব্যবস্থা কেন?

খানিক স্তব্ধ থাকিয়া সে পুনরায় প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা ধাই মা! এখানে এসে মুকুলের শরীরে কিছু তফাত বোধ হয় কি?"

সারদা প্রফুল্ল মুখে কহিল "হ্যাঁ বাবা! তা হয়েছে বইকি!—বলতে নেই শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে মুকুলের আমার আগেকার চেয়ে চেহারা ফিরেছে। এদ্দিনে আরও সারতে পারত, কিন্তু ছেলেটী ভারি মা-ন্যাওটো কিনা?—তবু তোমাকে পেয়ে সে এখন অনেকটা ভুলে আছে, আর তখনকার মত সদা সর্ব্বদা মা মা করে না। আহা! তা হবে না? তুমি ওকে যে রকম ভালবাসো, সংসারে কজন পিসে অতটা পারে বল?—সেই জন্যেই তো মুকুল পিসেমশাই বলতে অজ্ঞান হয়"

পুলক মনে মনে প্রীত হইয়া স্ত্রীর সন্ধানে গমন করিল। প্রথমে শয়ন ঘর তাহার পর বসিবার ঘর বারান্দা সমস্ত

খুঁজিয়াও যখন লীলাকে দেখিতে পাইল না, তখন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল তাহাদের কর্ত্রী এখন ভাণ্ডার ঘরে আছেন।

এই ভাণ্ডার ঘরের অপ্রিয় দৃশ্য ঔদরিকের পক্ষে লোভনীয় হইলেও সৌন্দর্য্য প্রিয় ভাবুক জনকে কোনও কালেই আনন্দ দান করিতে পারে না। কিন্তু আজ ছেলেদের ক্রীড়ার স্থান পরিবর্ত্তন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনে বাধ্য হইয়াই পুলককে সেই পথ ধরিতে হইল। সেখানে পঁহুছিয়া দেখিল, আজিকার ব্যাপার গুরুতর।

অদ্য ভাঁড়ারের মাসকাবারি জিনিষপত্র আনান হইয়াছে, তাই লীলা ভৃত্য পাচক ও ঝিয়ের সাহায্যে সেগুলি সব দেখিয়া, ওজন করাইয়া যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিতেছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার রসনাও দ্রুত সঞ্চালিত হইতেছিল "ওমা! একি? চিনি যে প্রায় আধ সের কম পড়ে গেল ঠাকুর!—ভাল করে ওজন করিয়ে নাওনা কেন?—অমন চোখবুজিয়ে থাক্‌লে কি কাজ চলে?" "এবার মাসকাবারের আগেই ঘোড়ার দানা ফুরিয়ে গেল যে?—হ্যাঁগা হরির মা!—তোমাকে না বলেছিলুম রোজ নিজের সাম্‌নে সহিসকে দানা ঢেলে দিতে?"

"ও তিমু! এবার কি তেলটাই পুড়িয়েছ বাছা! শুধু আস্তাবল, রান্নাঘর আর চৌকিদারের একটা হেরিকেনে কি এত তেল পুড়তে পারে কখনো? তায় আবার গ্রীষ্মি-কালের রাত্তির কতটুকুনই বা?"

বাজার হইতে আনীত মসলার মোড়কগুলি খুলিয়া ঝিয়ের প্রসারিত 'কুলা'র উপর ঢালিতে ঢালিতে লীলা এমনি সব কত অনুশাসনের কথাই বলিয়া যাইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যদের নিজের তরফ হইতে কৈফিয়ৎ, এবং ঝিয়ের 'কুলা'র ফটাস্ ফটাস্ ধ্বনি সেখানে একটা ছোট খাট বিপ্লবের স্থষ্টি করিয়াছিল।

সেখানে এই অনাগত লোকটীর অপ্রত্যাশিত আগমনে কর্ত্রী ও ভৃত্য সকলেরই মুখের কথা ও হাতের কাজ ক্ষণেকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। লীলা জিজ্ঞাসু উৎসুক দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিল। পুলক বলিল, "একটা বিশেষ দরকারে এসেছিলুম —তা তোমার তো এখন মোটেই সাবকাশ নেই দেখ্‌ছি।"

লীলা অঞ্চলে মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল, "সাবকাশ হবে কি করে বল ?—তুমি তো আর এসব একটীবার ভুলেও দেখবে না !—দেখ না বলেই তো চাকর বাকর সব নিজের মনে যাচ্ছে তাই ক'রে !"

গতিক ভাল নয় দেখিয়া বেচারা পুলক আবার যে পথে গিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া আসিল।

লীলা তাহারপর ভাঁড়ারের বাকি কাজ যথাসম্ভব সংক্ষেপে সারিয়া লইয়া স্বামীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি দরকার আছে বলছিলে না ?"

"নাঃ ! এমন কিছু দরকার নয়,—ছেলেরা আজ কোথায় ? —তাদের সকাল থেকে দেখিনি যে ?"

"তা'রা এদিকে থাক্‌লে বড় বেশীরকম গোলমাল করে, তোমার পড়া শোনার ক্ষতি হয়, তাই আজ থেকে তাদের ওধারের উঠানে খেলতে বলেছি—"

"কোনও দরকার ছিল না!" পুলকের মুখে বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "কে বল্লে ওরা গোলমাল করে? গাছ পালার ছায়ায় এদিকটা বেশ ঠাণ্ডা থাকে বলেই ওদের আমি এধারে খেলতে বলি, যুঁই তো চিরকালই তাই করছে—"

"হ্যাঁ, তাতো করেইছে! কিন্তু একটীর চেয়ে দুটী থাক্‌লে যে গোলমাল বেশী হতে পারে, তাতো তুমিও জানো?"

"না, কিছু হয় না,—ওরা দুটীতে বেশ তো খেলা করে বেড়ায়, আমার কাজের একটুও ব্যাঘাত করে না।"

"তা বেশ তো!—আমি এক্ষুনি তাদের বাগানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার ভালর জন্যেই বলেছিলুম আমি, তা তোমার যদি মনঃপূত না হয়, তাহলে কাজ কি আমার—"

বলিতে বলিতে লীলা অপ্রসন্নমুখে ক্ষর ক্ষর করিয়া চলিয়া গেল।

পরক্ষণেই উদ্যানের দিকে শিশুদ্বয়ের মৃদু পদধ্বনি ও চাপা হাসির শব্দ শুনিয়া পুলক বুঝিতে পারিল, বন্ধন-মুক্ত কুরঙ্গ দুটী এতক্ষণে মুক্তি পাইয়াছে। সে তখন নিশ্চিন্ত মনে আবার কাজে বসিল। খানিক পরে একবার জানালায় উঁকি দিয়া দেখিল যুঁই ও মুকুল তাহাদের কল্যকার অসমাপ্ত

বাগান ও পুকুর তৈয়ার করিতে পরমোৎসাহে লাগিয়া গিয়াছে।

যুঁই তাহার ছোট্ট কোদালখানি দিয়া পুকুর কাটিতেছে,—মাটি ফেলিতেছে, ঘর্ম্মাক্ত দেহে, আরক্ত মুখে শ্রম সাধ্য কার্য্যগুলি সমস্তই সে একা একা করিতেছে, আর মুকুল পুকুর পাড়ে নরম মাটির মধ্যে ছোট চারা গাছগুলি আস্তে আস্তে বসাইতেছে। পুলক একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস-ত্যাগ করিল।—পিতৃপরায়ণা যুঁই তাহা হইলে পিতার উপদেশ ভুলে নাই।

খেলার ব্যস্ততার মধ্যেও সে এক সময় পুলকের ঘরের দিকে ছুটিয়া আসিল—ক্ষুদ্র কচি হাতখানি জানালার মধ্যে গলাইয়া দিয়া সে হর্ষভরে কহিল "বাবা,—বাবা! এই নাও, শীগ্‌গির!"

"কি এনেছ মা লক্ষ্মী?"

পুলকের প্রসারিত করে এক মুঠা পাকা কাঁচা টেঁপারি ফল দিয়া যুঁই হাসিমুখে বলিল, "একটু বেছে খেও বাবা!—যে গুলোয় ভাল রং ধরেনি সেগুলো ফেলে দিও। আমার এখন মোটেই সময় নেই, নইলে পাকা পাকা বেছে দিতুম।"

বলিতে বলিতে যুঁই আবার একদৌড়ে ফিরিয়া গেল। কিন্তু অতঃপর পুলকের আর কাজে মন বসিল না। ফলগুলি হাতে লইয়া সে সেইখানেই চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া বালক বালিকা দুটীর খেলা দেখিতে লাগিল।

পুকুর কাটা হইয়া গিয়াছে। জলের ঝাঁরিটা হাতে লইয়া যুঁই পুকুরে জল ঢালিতেছে। মুকুল কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে যুঁইর কারিগরি দেখিতেছে।

যুঁইর শ্রমারক্ত সুন্দর মুখখানি স্বেদজলে সিক্ত হইয়া শিশির নিষিক্ত প্রভাত পদ্মের মত মনোরম মধুর দেখাইতেছে। পরিধানে দুগ্ধফেননিভ শুভ্র সূক্ষ্ম মসলিনের ফ্রিল দেওয়া ফ্রক, মাথার এলোচুলগুলি গোলাপী রেশমী ফিতায় সংবদ্ধ হইয়া পিঠের উপর দুলিতেছে। অনাবৃত নিটোল সুন্দর হাত দুখানিতে শুধু দুই গাছি পালিশের মাটা বালা, কণ্ঠে এক ছড়া শুভ্র উজ্জ্বল মুক্তার কণ্ঠী।

সেই অম্লান উজ্জ্বল পুণ্য বৈশাখ প্রভাতের মত আনন্দ-দায়িনী সুন্দরী বালিকা মূর্ত্তি, তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে আনন্দ ও উৎসাহের ধারা যেন ঝরিয়া ক্ষরিয়া পড়িতেছিল। দেখিয়াই উচ্ছ্বসিত বাৎসল্য স্নেহে পুলকের চিত্ত মুগ্ধ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পুকুরে জল ভরা হইয়া গেলে যুঁই পুনরায় পিতার কাছে ছুটিয়া আসিল, পুলককে তদবস্থায় দণ্ডায়মান দেখিয়া সে সানন্দে বলিল, "আজ তো তোমার কাজ নেই, আমাদের নতুন বাগান দেখবে চল না বাবা!—কেমন সুন্দর পুকুর করেছি, আবার একটা মন্দিরও হয়েছে।"

কন্যার হর্ষদীপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া পুলক হাসিয়া বলিল, "কে বল্লে আজ আমার কাজ নেই মা?"

"কে আবার বলবে ? আমার কি চোখ নেই ? আমি কি দেখতে পাইনি ! তুমি সকাল থেকে কেবল এদিক ওদিক করে বেড়াচ্ছ ! খানিক বাগানে ঘুরে বেড়ালে, তারপর মুকুলের ঘরে গেলে, তারপর শোবার ঘরে, আবার ভাঁড়ারের দিকেও গিছলে একবার—আমি যে সব দেখেছি বাবা !"

শুনিয়া পুলক বিস্মিত হইয়া গেল। ছেলেদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে কিছুই এড়াইবার জো নাই। আজ স্থানান্তরিত হইয়াও তাহারা পুলকের গতিবিধি আগাগোড়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে !

হাসিতে হাসিতে পুলক কন্যার হাত ধরিয়া বলিল, "আচ্ছা চল তাহলে তোমাদের খেলাটাই আগে দেখে আসি গিয়ে।"

যুঁই পিতাকে লইয়া গিয়া তাহার যত্ন প্রস্তুত কৃত্রিম পুষ্করিণী, ফুলের বাগান, দেবমন্দির সমস্ত দেখাইয়া সগর্ব্বে আহ্লাদে কহিল, "এ সমস্তই আমি নিজের হাতে করেছি বাবা। মুকুল খালি ঐ ফুলগাছ গুলো বসিয়েছে, তাতেই দেখনা, ছেলে একেবারে ঘেমে তিরকুণ্ডি ! মুকুল একেবারেই খাটতে পারে না বাবা !"

যুঁইর কথায় মুকুল একটুখানি অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া রুমালে ঘাম মুছিতে লাগিল।

মুকুলের স্বেদাক্ত ক্লান্ত মুখকান্তি দেখিয়া পুলক সহানুভূতির স্বরে কহিল, "মুকুল আর একটু সেরে উঠলেই সব পারবে রাণী ! যাক্ খেলাতো তোমাদের খুব হ'ল, এখন এসো, আমরা বেশ

আরাম করে বসে এই টেঁপারি গুলো খাই তিনজনে ভাগ করে।”

যুঁই একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, “ঐ তো কটি টেঁপারি তাও এখনো খাওনি বাবা! হাতে করেই রেখেছ?

“অতগুলো খেলে আমার যে দাঁত ‘টকে’ যাবে মা! এবার এস না, সকলে মিলে মিশে খেয়ে ফেলি।”

শ্রান্ত মুকুলকে বিশ্রাম দিবার অভিপ্রায়ে পুলক তাহাদের দুটী ভাই বোন্‌কে লইয়া তরুছায়ায় কাষ্ঠাসনে আসিয়া বসিল।

কিন্তু যুঁই চুপ করিয়া বসিবার মেয়ে নহে, টেঁপারিগুলি নিঃশেষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার উঠিয়া পড়িল। খেলায় তাহার কখনও শ্রান্তি ছিল না।

সেদিন মুকুলের কাছে সেই গানটী শুনিয়া পর্য্যন্ত পুলকের বড় ইচ্ছা হইত, ছেলেটীর কাছে সে যূথিকার বিষয় আরও কিছু জানিয়া লয়। তাহার বিবাহিত জীবন কিরূপে অতি-বাহিত হইতেছে, মলয়কে পতিত্বে বরণ করিয়া সে প্রকৃতই সুখী হইতে পারিয়াছে কি? কিন্তু কন্যা সর্ব্বদাই কাছে কাছে থাকায় সে সুযোগ একদিনও ঘটিয়া উঠে নাই।

তাই এখন মুকুলকে নিরালায় পাইয়া পুলক মনে মনে সন্তুষ্ট হইল। সে বলিল “তুমি একটু জিরিয়ে নাও মুকুল! যুঁইটাতো মোটেই চুপ করে বসতে পারে না।”

একটী ছোট পাখীর প্রতি ধাবমানা যুঁইয়ের দিকে চাহিয়া

মুকুল সকৌতুকে হাসিয়া বলিল "হ্যাঁ পিসেমশাই! যুঁই খেলতে বড্ড ভালবাসে না?"

"হ্যাঁ,—তুমি বুঝি খেলতে ভালবাসো না মুকুল?"

"বাসি বইকি!—কিন্তু আমার সব চেয়ে কি ভাল লাগে জানো পিসেমশাই?"

"কি?"

মুকুল কিছু লজ্জিতভাবে বলিল "তোমার কাছে গল্প শুন্‌তে—"

"সত্যি?" মুকুলের পিঠের উপর হাত রাখিয়া পুলক সস্নেহে কহিল, "কিন্তু আমাকে তো তোমাদের কোনও গল্পই শোনালে না মুকুলমণি!—"

মুকুল তাহার বড় বড় শান্ত চক্ষুদুটী পুলকের মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের আবার কি গল্প পিসেমশাই?"

"এই তোমাদের বাড়ীর কথা—তোমার মা'র—"

মায়ের নাম শুনিবামাত্র বালকের বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে শোণিতের রক্ত উচ্ছ্বাস দ্রুত খেলিয়া গেল। মায়ের প্রসঙ্গ যে তাহার বড়ই প্রিয় ছিল! উৎসাহিত হইয়া সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আমার মা'র কথা তুমি শুন্‌বে পিসেমশাই?—আমার মা—"

—এস দেখি একবার! পাখীটাকে আমি একলা কিছুতেই ধর্‌তে পার্‌ছি না। এধার দিয়ে যাই, ওধার দিয়ে

ফুড়ুৎ করে পালিয়ে যায়—বাবারে বাবা! হাঁপিয়ে গিয়েছি!" বলিতে বলিতে যুঁই সত্যই হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল।

মুকুলের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

পুলকের সেদিনকার আয়াসলব্ধ শুভমুহূর্ত্তটুকুও এমনি করিয়া কাটিয়া নষ্ট হইয়া গেল।

চৌদ্দ

খানিক পরেই যুঁইর উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া পুলক সত্বর উঠিয়া গিয়া দেখিল সারি বাঁধা 'হেনার' গাছগুলির কাছে দাঁড়াইয়া যুঁই মুকুলকে ক্রোধভরে তিরস্কার করিতেছে, আর অপমানাহত মুকুল রুদ্ধরোষে আরক্ত হইয়া অধোমুখে দণ্ডায়মান।

উদ্বিগ্নচিত্তে পুলক জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে যুঁই? অমন করে মুকুলকে বকছ কেন?"

"বক্‌ব না?—"

যুঁই রাগে মুখ চোখ লাল করিয়া সগর্জ্জনে বলিয়া উঠিল "তোমার আদুরে ছেলে বলে বুঝি ওকে আমি বকবও না একটু! তা'হলে আমার সঙ্গে লাগ্‌তে আসে কেন? জেনে শুনে পাখীটাকে উড়িয়ে দিলে? 'পাখী ধরলে পাপ হয়!' ভারিতো আমার গুরুমশাই হয়ে এসেছেন! সকল তাতে কর্ত্তামো করা! পাজি! আহাম্মকের ধাড়ী কোথাকার!"

এই মুকুলকে সঙ্গীরূপে প্রাপ্ত হইয়া বালিকা যুঁই প্রথমটা বাস্তবিক বড় আনন্দিত হইয়াছিল, ছেলেটীকে দুর্ব্বল অসহায় দেখিয়া সে তাহার সহিত পূর্ব্বাবধিই বেশ সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করিতেছিল। কিন্তু ইদানিং বালিকার মন যে কেন মুকুলের দিক হইতে বিমুখ বিতৃষ্ণ হইয়া গেল, বন্ধুর প্রতি সেই সদ্ভাব ও সম্প্রীতির ভাবটুকু বিদূরিত হইয়া তাহার স্থানে

কেমন করিয়া বিরাগ ও বিদ্বেষের বিষ সঞ্চিত হইতে লাগিল, সেই কথাই এখন বলিব।

যুঁইয়ের পর আর সন্তানাদি না হওয়ায় সেই পিতা মাতার একমাত্র আদরের পুত্তলী ছিল।

বিশেষতঃ পিতার স্নেহ মমতা এতদিন সে একাই সবখানি দখল করিয়া আসিয়াছে। তাহার পর একদিন মুকুল কোথাকার এক অদেখা অপরিচিত বালক মুকুল কোথা হইতে আসিয়া তাহার চিরদিনের পূর্ণ অধিকারে ভাগ বসাইল। সে যেন কোন্ যাদুমন্ত্রবলে পিতাকে তাহার দিক্ হইতে বিমুখ করিয়া ক্রমশঃ নিজের দিকে টানিতে লাগিল।

যুঁই তাহার পিতাকে আর পূর্ব্বের মত সদা সর্ব্বদা কাছে কাছে পায় না, তিনি এখন মুকুলকে লইয়াই সকল সময় ব্যস্ত। যুঁইর চেয়ে এখন সেই যেন তাঁহার আপনার হইয়া উঠিয়াছে! দেখিয়া শুনিয়া বালিকার সরল ক্ষুদ্র হৃদয়খানি দারুণ অভিমানে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সে কেবল ভাবিত তাহাদের সুখময় আনন্দকাননে এই ক্রূর সর্প শিশু কোথা হইতে আসিয়া জুটিল?

এইরূপে যুঁই ক্রমশঃ তাহার 'সরিক' মুকুলকে বিদ্বেষ ও বিরাগের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যুঁই এই বিষয় লইয়া পিতার কাছে প্রকাশ্যে এপর্য্যন্ত কোনও অভিযোগ জানায় নাই বা মুকুলের প্রতিও বিশেষ কোনও অসদ্ব্যবহার করে নাই। কিন্তু উপর্য্যুপরি আঘাত পাইয়া বালিকার

কোমল চিত্ত এতই উত্যক্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, যে আজ আর সে কিছুতেই ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিল না, পিতা ও মুকুলের মুখের উপরই নিজের মনোভাব মুখরার মত স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

দুহিতার এই ধৃষ্টতায় পুলক রুষ্ট হইয়া ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "ছি ছি! যুঁই!—তুমি এমন দুষ্টু, এমন অসভ্য হয়ে উঠেছ কেন? ছোট লোকের মত গাল মন্দ করতে একটুও লজ্জা হ'ল না তোমার?"

এরূপ কঠিন কথা পিতার মুখে ইতিপূর্ব্বে কখনও শুনে নাই, আদরিণী যুঁই তাই এটুকও ভর্ৎসনা সহ্য করিতে পারিল না "ফের মুকুল আমার পাখী উড়িয়ে দিলে কেন?" বলিতে বলিতে সে সেইখানে ঘাসের উপর বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মুকুল অপরাধীরভাবে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "আমি তো পাখীটাকে জেনে শুনে উড়িয়ে দিইনি পিসে মশাই!—সত্যি বলছি—ধরতে গিয়ে সেটা আপনি উড়ে গেল!"

পুলক আর কিছু বলিল্ না, রোরুদ্যমানা কন্যার দিকে চাহিয়া সে স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার নিজের হাতে যত্নে গড়া মেয়েটার চরিত্রের এই হীনতা আজ তাহাকে বাস্তবিক বড় মর্ম্মাহত করিয়াছিল।

কিন্তু ব্যাপারটা আগাগোড়া তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে

পারিত যে দোষটা বালিকা যুঁইয়ের চেয়ে তাহার নিজের দিক্ দিয়াই বেশী হইয়াছে।

সেই সময় যুঁইর ঝি তাহাদের খাবার জন্য ডাকিতে আসিতেছিল, ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া সে ফিরিয়া গিয়া কর্ত্রীকে এই সংবাদ প্রদান করিল। আত্মীয় পুত্র মুকুলের উপর পুলকের এই অসম্ভব মমতা কর্ত্রীর মত বাড়ীর চাকর দাসীরাও প্রসন্ন চক্ষে দেখিতে পারিত না।

লীলা দাসীর মুখে সংবাদ শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিল। আজিকার ঘটনা সে অনুমানে বুঝিয়া লইয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল "যুঁইকে তুমি বকেছ বুঝি?"

পুলক গম্ভীর মুখে দুঃখিত স্বরে বলিল "হ্যাঁ,—আজকাল মেয়েটার মেজাজ এমন খিট্‌খিটে হয়ে গেছে কেন বল দেখি? আগে তো এমন ছিল না। আজ আমার সামনেই মুকুলকে খাঁমখা গালাগালি দিলে।"

লীলা মুখ অন্ধকার করিয়া অপ্রসন্ন স্বরে বলিল "ও যে কেন এমন ধারা হয়ে গেছে, তা আমার চেয়ে তুমিই ভাল জানো!—চিরটা কাল মেয়েকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলে এখন যদি তাকে—" কি ভাবিয়া লীলা কথাটা বলিতে বলিতে থামিয়া গেল।

পুলকের চিরশান্ত সহিষ্ণু প্রকৃতি এবার উষ্ণ হইয়া উঠিল। সে বিরক্তিভরে কহিল "এখন তাকে আমি কি করছি কথাটা স্পষ্ট করেই বল না লিলি?"

লীলাও উত্তেজিত হইয়া বলিল "কি করছ না করছ, সেটা আমার চেয়ে তুমি নিজেই ভাল বোঝ! এতদিন তোমার আদর সোহাগ মেয়েটা একাই পেয়েছে, কেউ তার ভাগী ছিল না, এখন হঠাৎ কোথাকার একটা উড়ে এসে জুড়ে বসা ছেলেকে নিয়ে তুমি—"

"উড়ে এসে জুড়ে বসা ছেলে! বল কি লীলা? মুকুল কি তোমার এতই নিষ্পর?"

মনের উত্তেজনায় লীলা আজ ভুলিয়া গিয়াছিল যে মুকুলের সহিত তাহার স্বামীর চেয়ে নিজেরই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, মুকুল তাহার এক মাত্র সহোদরের সন্তান। তাই এখন স্বামীর কথায় কিছু লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া সে অবনত মুখে শশব্যস্তে বলিল, "আমি কি তাই বলছি নাকি? মুকুল যে আমার ভাইপো, তা ছাড়া তোমার পুরোনো বন্ধুর ছেলে তাতো আমি অস্বীকার করছি না,—তবে বেশী বাড়াবাড়িটা কিছুরই ভাল নয়—"

—পুরোনো বন্ধুর ছেলে!—পুলকের বুকের ভিতর ধ্বক করিয়া উঠিল!—লীলার এই কথা তাহার অন্তরের একটা গোপন বিষয়ের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত নহে কি? তবে স্বামীর হৃদয়নিহিত গূঢ় রহস্যের আভাস লীলা পাইয়াছে নাকি?

পুলক অপরাধীর মত মাথা হেঁট করিয়া গিয়া অভিমানিনী খুকুকে কোলে তুলিয়া লইল, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সে দিন পুলকের মনের অবস্থা বড়ই খারাপ; সেজন্য মাথাধরার ছুতায় সে সান্ধ্য ভ্রমণে যোগ দিল না, লীলা একাই গেল।

পুলক দুশ্চিন্তা ভারাক্রান্ত চিত্তে তাহার নির্জ্জন কক্ষে কৌচের উপর পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, মুকুল বেচারা মুকুল! বাড়ীর কর্ত্রী হইতে চাকর দাসী পর্য্যন্ত সকলেই এই নির্দ্দোষী নিরীহ বালকটীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান! এই নিষ্করুণ পরিবারের অনাদর অবজ্ঞা ও সংসারের ঝড় ঝাপ্‌টা হইতে সে একা তাহাকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে?

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবু ঘরে আলো জ্বলিল না। ঘর ভরা আবছায়া অন্ধকারের মধ্যে কাহার সতর্ক মৃদুপদধ্বনি শুনিতে পাইয়া পুলক উৎকর্ণ হইয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল "কে?" উত্তর আসিল "আমি,—তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলে পিসে মশাই?"

"না,—আলোটা জ্বেলে দেও তো মুকুল!"

লীলা ছেলে মেয়ে লইয়া বেড়ান কোন কালেই ভালবাসিত না, সুতরাং তাহাদের বেড়াইবার ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র ছিল।

মুকুলকে অসময়ে দেখিতে পাইয়া পুলক বলিল, "তুমি আজ বেড়াতে যাওনি মুকুল?"

আলোর সুইচটা খুলিয়া দিয়া মুকুল পুলকের পার্শ্বে আসিয়া বলিল "না পিসে মশাই! আজ আমি যাইনি, যুঁই একাই গিয়েছে।"

"কেন ? যুঁই তোমায় নিয়ে গেল না বুঝি ?"

মুকুল একটু কুণ্ঠার সহিত কহিল, "সে নিয়ে যাবে না কেন ?—আমি নিজেই গেলুম না,—এর জন্যে পিসীমা হয় তো রাগ করবেন।"

"তবে কেন গেলে না বাবা ?"

আনত মুখে মুকুল মৃদু কোমল স্বরে কহিল, "তোমার অসুখ করেছে পিসেমশাই ! বাড়ীতে তুমি একা থাক্‌বে ?"

বালকের এই আন্তরিকতাপূর্ণ সহানুভূতিটুকু পুলকের অন্তর স্পর্শ করিল।

সে মুকুলকে গভীর আবেগে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া মমতা-গাঢ় কণ্ঠে কহিল, "তোকে আমি কেমন করে বাঁচিয়ে রাখব মুকুল মণি আমার !"

পিসেমহাশয়ের সেই ব্যথাভরা সস্নেহ বচনের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার বলিবার করুণ ভঙ্গীতে কোমল প্রকৃতি মুকুলের চক্ষে জল আসিল। সে তাড়াতাড়ি পুলকের বুকে মুখ লুকাইয়া ব্যথিতভাবে বলিল, "তুমি কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ পিসেমশাই ? আমি তো এখন বেশ ভাল আছি।"

"ভাল আছিস্ ? সত্যি বলছিস্ বাবা ?"

"হ্যাঁ পিসেমশাই ! সত্যি বল্‌ছি—"

গভীর জলে মজ্জমান ব্যক্তি যেমন সম্মুখে একটা তৃণ দেখিতে পাইলেও সাহায্যের ভরসা পায়, তেমনি বালকের

এই কথাটুকুর উপর নির্ভর করিয়া পুলক অনেকটা সুস্থ ও আশ্বস্ত চিত্তে উঠিয়া বসিল।

লীলা সে দিন একটু সকাল করিয়াই বেড়াইয়া ফিরিল। স্বামীকে কতকগুলি অপ্রিয় রূঢ় বাক্য বলিয়া আজ তাহারও মন সারাদিন ভাল ছিল না। তাই ইচ্ছা ছিল তাঁহার কাছে স্বকৃত অপরাধের জন্য নিভৃতে ক্ষমা চাহিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি সন্ধি করিয়া লয়, সেই মতলবে কাপড় না ছাড়িয়াই সে স্বামী সমীপে আসিল,—কিন্তু দরজার কাছে আসিতেই সে দেখিতে পাইল ঘরে পুলক একা নহে, তাহার কোলের কাছে মুকুলও বসিয়া আছে।

পুলক তখন দিব্য নিশ্চিন্ত মনে মুকুলকে বই পড়াইয়া শুনাইতেছিল। সেই মুকুল—যাহাকে লইয়া আজ এত কাণ্ড হইয়া গেল! রাগে লীলার গা জ্বলিয়া গেল। দুঃখে ও ক্ষোভে সে একটীও কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না, মিনিট দুয়েক সেইখানেই নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মুকুলও স্বামীর প্রতি একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সে আবার নিজের ঘরের দিকে ফিরিয়া গেল।

পুলক তাহা লক্ষ্য করিল। সে নীরবে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। এমন ঘটনা পূর্ব্বে কোনও দিন ঘটে নাই! পুলক দেখিল এই মুকুলকে লইয়া তাহাদের স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একটা মনান্তরের ব্যবধান ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তাহা রোধ করিবারও উপায় নাই।

মুকুলের মুখ চাঁহিয়া তাহার মঙ্গলের জন্য এখন পুলককে চারিদিকের ঘাত প্রতিঘাত সমস্তই মুখ সহ্য করিতে হইবে।

পনেরো

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার একমাস পরের কথা।

লীলার বাল্যসখী পুষ্পরেণুর গৃহে সেদিন তাহাদের বাটীশুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। রেণুর পুত্রটীর অন্নপ্রাশন, উপর্য্যুপরি দুই কন্যার পর এই ছেলেটী, তাই তাহার শুভান্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে বাটীতে বেশ একটু সমারোহ হইয়াছে।

ভোজনের আয়োজন সেই রাত্রে, কিন্তু তা'ছাড়াও সমস্ত দিবস ব্যাপী গান বাজনা ও আমোদ উৎসবের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

এ বেলার আহারাদি সকাল সকাল সারিয়া লইবার জন্য লীলা ছেলেদের ডাকিয়া পাঠাইল। যুঁই আসিল কিন্তু মুকুল আসিল না। লীলা কন্যাকে একা আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মুকুল এল না যে? সে আবার কখন খাবে? রেণু এত করে বলে পাঠালে সকাল করে যেতে, তা আর হচ্ছে না দেখছি!—এখন পর্য্যন্ত খাওয়ার হাঙ্গামাই চুকল না—তা যাব কখন?"

যুঁই তাড়াতাড়ি আহারে বসিয়া বলিল, "মুকুল আজ খাবে না বোধ হয়, তার শরীর নাকি ভাল নেই!"

"সে আবার কি? এই তো সকালে বেশ ছিল।"

সারদা বিষণ্ণ মুখে আসিয়া জানাইল—মুকুলের শরীরটা

আজ বাস্তবিক তেমন ভাল নাই, মাথা ভার, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, সামান্য জ্বরভাবও বোধ হইতেছে। সুতরাং তাহাকে আজ আর ভাত দিয়া কাজ নাই।

লীলার পরিপূর্ণ উৎসাহে বাধা পড়িল, সে একটু চিন্তিত ভাবে কহিল "তাইতো!—আজ ঠিক্ দিন বুঝে অসুখ হ'ল? তা হলে নেমন্তন্ন বাড়ী যাবার—"

"নেমন্তন্ন বাড়ী তোমরা সবাই যাওনা মা! মুকুলের কাছে আমি তো রয়েছি।"

"আচ্ছা, তবে তাই হ'ক, তুমি তাহলে এক বাটী গরম দুধ তা'র জন্যে নিয়ে চল, তারপর আমিও আসছি এখনি।"

তখনকার মত সকল ব্যবস্থা সারিয়া লীলা স্বামীকে স্নানাহারের জন্য তাড়া দিতে আসিয়া দেখিল, তাঁহার খাতা-পত্র তখনও ছড়ান রহিয়াছে। লীলা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ওমা! তুমি কখন উঠবে গো? এতখানি বেলা হ'ল, এখনও—"

পুলক কলম রাখিয়া ঘড়ীর দিকে চাহিয়া বলিল, "কই বেলা তো বেশী হয় নি! ওহো! আজ তোমার সখীর বাড়ী নিমন্ত্রণ বটে! আমার তা মনেই ছিল না। ছেলেরা খেয়ে নিয়েছে?"

"হ্যাঁ যূঁই খাওয়া দাওয়া করে কাপড় পরছে, কিন্তু মুকুল আজ খাবে না, নেমন্তন্ন বাড়ী সে বোধ হয় যেতেও পারবে না।"

পুলক অতিমাত্র ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসিল, "কেন কেন? কি হয়েছে মুকুলের? আবার বুঝি অসুখ হ'ল তা'র?"

"অসুখ এমন কিছু নয়, সামান্য জ্বরভাব হয়ে শরীরটা ম্যাজ্‌মেজে হয়ে রয়েছে। তা হবে না? যা রোদে রোদে ঘুরে বেড়ায়, বারণ করলেও শোনে না তো!"

পুলক উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল, "তা হলে এইবেলা একবার ডাক্তারকে ডেকে দেখিয়ে দেব নাকি? ও যা রুগ্ন ছেলে—"

মুকুলের জন্য স্বামীর এই অতিরিক্ত উদ্বেগ ও ব্যস্ততা দেখিয়া অপ্রসন্ন লীলা অগ্রাহ্যের ভাবে কহিল, "এখন আর কিছু করবার দরকার নেই, একটু কুইনাইন আর এস্পিরিণ খাইয়ে দিয়ে এসেছি, ঐতেই সেরে যাবে 'খন।"

পুলক চিন্তিত হইয়া বলিল, "কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কি? তুমি এখন উঠবে কি না বল তো? রেণু যে তা'র মাথার দিব্যি দিয়ে—"

"তা তুমি এতক্ষণ যুঁইকে নিয়ে চলে গেলে না কেন?—মিথ্যে আমার জন্যে আটকে থাকবার তো দরকার ছিল না।"

"বারে, তুমি যাবে না বুঝি?"

"সকলে মিলে চলে গেলে মুকুলের কাছে কে থাক্‌বে লিলি?"

"মুকুলের কাছে তো সারদা রয়েছে। আর তা'র অসুখ তো এমন কিছু বেশী হয় নি, যা'র জন্যে এত ভাবনা—"

"বেশী হয় নি,—কিন্তু হ'তে কতক্ষণ লাগে? দুপুর নাগাৎ জ্বরটা যদি বাড়ে, তাহলে কে সামলাবে বল?"

লীলা দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "তা হ'লে আমিও এখন যাব না।"

পুলক আপত্তি তুলিয়া ব্যগ্রতার সহিত কহিল, "না না, সেকি হয়? তাহলে ওঁরা যে ভারি দুঃখিত হবেন লিলি! তুমি যুঁইকে নিয়ে এখনি যাও—ও বেচারি তামাসা টামাসা কিছুই দেখতে পাবে না? মুকুল যদি ভাল থাকে, অসুখটা আর না বাড়ে, তাহলে আমিও শীগগিরি আসছি—যাও, আর দেরী করো না। আমার খাবার দাবার সব ঠাকুর দিয়ে দেবে'খন—"

অগত্যা লীলা ক্ষুণ্নমনে কন্যাকে লইয়া সখী গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল।

মুকুলের জ্বরটা আর বাড়িল না বটে, কিন্তু শারীরিক কষ্ট কিছুমাত্র কমিল না।

তথাপি পুলককে কাছে কাছে পাইয়া অসুখের কষ্ট ও অস্থিরতার মধ্যেও সে বেশ একটু আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। দ্বিপ্রহরের পর মুকুলের অস্থিরতা একটু কমিলে পুলক তাহার স্নেহময়ী ধাত্রী সারদাকে জোর করিয়া আহার করিতে পাঠাইয়া দিল। মুকুলের সামান্য অসুখেও সারদা আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করিয়া বসিত।

মুকুল সবেমাত্র একটু চক্ষু বুজিয়াছে, তাহাকে নিদ্রিত মনে করিয়া পুলক নীরবে তাহার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। মুকুল সহসা চক্ষু মেলিয়া ডাকিল, "পিসেমশাই!"

"কেন বাবা! কি বলছ?"

"না কিছু নয়।"

মুকুল একটু থামিয়া একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বর্ম্মা এখান থেকে অনেকদূর, না পিসেমশাই? বাব্বা! দেখেছি তো আসবার সময়, সে পথ যেন আর ফুরোতেই চায় না!"

বালকের মনের ব্যাকুলতা যে কোনখানে, তাহা বুঝিতে পারিয়া পুলক স্নেহভরে কহিল, "মা'র জন্যে মন কেমন করছে মুকুল?"

মা'র নামে মুকুলের চোখ দুটী ছল ছল করিয়া আসিল। সে উন্মনা উদাসভাবে বলিল, "আমার এই অসুখ যদি শীগ্‌গির না সারে, আরও বাড়ে,—তাহলে কি হবে পিসে মশাই?—মা'র কাছে আমি কি করে যাব?"

ব্যথিত বালককে সস্নেহ মিষ্ট বচনে সান্ত্বনা দিয়া পুলক বলিল, "অসুখ তোমার বাড়বেই বা কেন মুকুল? অমন একটু আধটু শরীর খারাপ কা'র না হয়?—আর যদি তোমার মা'র জন্যে এতই বেশী মন কেমন করে তাহলে—"

"না পিসে মশাই!—তুমি কাছে থাকলে আমার মাকে বেশী মনেও পড়ে না। তবে আমার একটু অসুখ হলেই মা একেবারে কাছ ছাড়া হতেন না কিনা—"

"তোমার মা'র বদলে আমি যে তোমার কাছে রয়েছি মুকুল!—তবুও মা'র জন্যে ব্যস্ত! তাহলে তুমি আমাকে একটুও ভালবাসো না দেখছি।"

মুকুলের মুখে সলজ্জ সুখের হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে

তাহার ছোট হাত দুখানি পুলকের কোলের উপর মেলিয়া দিয়া আদর মাখানো স্নিগ্ধস্বরে বলিল "না পিসে মশাই! তোমাকে আমি অনেক—অনেক ভালবাসি!—নইলে মাকে ছেড়ে এতদিন —বাপ্‌রে! কম সময়টা তো নয়! দু দুটা মাস!—এদ্দিন কি থাক্‌তে পারতুম, আমি কোন্ কালেই মরে যেতুম!"

বালকের অকপট মমতা ও সরলতায় মুগ্ধ হইয়া পুলক তাহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিল "তোমার বাবার কথা মনে পড়ে না মুকুল?"

"পড়ে বই কি?—কিন্তু মা'র মতন সকল সময় নয়।—মা' যে আমায় বড্ড ভালবাসেন পিসে মশাই!"

"আর বাবা?"

"বাবাও ভালবাসেন, কিন্তু মা'র মতন নয়!"

পুলক এবার হাসিতে হাসিতে সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "আর আমি?—আমি তোমাকে কি রকম্ ভালবাসি বলতো?"

স্নেহের কাঙাল শিশু পুলকের কোলের কাছে আরও সরিয়া আসিয়া মৃদু মধুর স্বরে বলিল—

"তুমি আমাকে ঠিক্ মা'র মতনই ভালবাসো পিসে মশাই! আর আশ্চর্য্যের কথা, আমার মা'র স্বভাবটাও অনেক মেলে তোমার সঙ্গে!—তিনিও তোমার মত কারুর সঙ্গে বড় একটা মেলা মেশা করতে ভালবাসেন না, বেশীর ভাগ আমাকে নিয়েই সময় কাটাতেন, সেজন্যে সময় সময় বাবা কত বিরক্ত হতেন। আর বই পড়বার বাতিকও মা'র খুব আছে।"

পুলক উৎসুক হইয়া বলিল, "তোমার মা পড়তে বুঝি খুব ভালবাসেন ?"

"খুব !—একখানা লাল রংয়ের কবিতার বই আছে, কি নাম তার ভুলে যাচ্ছি যে— হ্যাঁ 'মানসী' সেখানা বুঝি তোমার লেখা পিসে মশাই ?"

পুলকের দীর্ঘকালের পিপাসা শুষ্ক তৃষিত বক্ষে বালক মুকুল যেন অমৃতের মত স্নিগ্ধ বারিধারা নিষেক করিল। পুলকের চির পিপাসিত চিত্ত সেই অমৃত পানের আশায় আরও প্রলুব্ধ আকুল হইয়া উঠিল। সে অতিমাত্র আগ্রহের সহিত বলিল, "হ্যাঁ, সে বই আমার প্রথম লেখা—তোমার মা বুঝি সেখানা আজও রেখে দিয়েছেন ?"

"শুধু রেখেছেন ! সে বই রোজ একবার করে না পড়লেই নয় !—সমস্ত কবিতা গুলোই বোধ হয় মা'র মুখস্থ করা আছে।"

শুনিয়া পুলকের বক্ষের শোণিত চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং প্রাণের ভিতর একটা নবীন আশা অপূর্ব্ব পুলক মুঞ্জরিত হইল। তবে কি যূথিকাও তাহাকে মনে মনে ভালবাসে ?— না না, বৃথা এ সন্দেহ !—যূথিকা মনে করিলেই তো তাহার হইতে পারিত,—মলয় তো তাহার অনিচ্ছায় পাণিগ্রহণ করে নাই !

তবে ?—হতভাগ্য পুলককে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া আবার এ কৃপা প্রদর্শন কেন ? কিন্তু পুলক কি ভুল বুঝিতেছে না ?

স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী কত লোক কত কবির রচনা বেশী মাত্রায় পছন্দ করেন, এবং সেই কবির লেখাই সদাসর্ব্বদা পড়িতে ভালবাসেন।

পুলক নিজেই তো রবিঠাকুরের একজন ভক্ত উপাসক। উক্ত কবির কাব্যগুলি সে প্রায় সমস্তই নিজের লাইব্রেরীতে সাজাইয়া রাখিয়াছে, ইহা তো কোনও আশ্চর্য্যের কথা নয়! পুলক জানে তাহার লেখা যূথিকা পূর্ব্বাবধিই পড়িতে ভালবাসিত তাই বলিয়া, যূথিকার এই পক্ষপাতিতাকে কি বুঝিতে হইবে সে তাহাকে—না না, পুলক পাগল হইয়াছে নাকি?

পুলককে নিস্তব্ধ দেখিয়া মুকুল সাগ্রহে কহিল, "আচ্ছা পিসেমশাই! তুমি কথা কইতে কইতে হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে যাও কেন?—মা' ও ঠিক এই রকম,—এই দিব্যি কথা কইছেন, হাস্‌ছেন,—আবার তক্ষুনি একেবারে চুপ্!"

পুলক একটা ক্ষোভের নিঃশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিল, "আমার স্বভাবই এই রকম মুকুল!—তুমি জানো না আমার জীবনে একটা মস্ত বড় ভুল রয়ে গেছে,—যার জন্যে আমি—"

—"আরে একি?"—পুলকের কথায় বাধা দিয়া মুকুল হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, "কি আশ্চর্য্য পিসেমশাই! ঠিক এই কথাটা মা'ও একদিন বলেছিলেন—"

"কি বলেছিলেন?"

"বলেছিলেন—তুমি যখন যে কাজ করবে মুকুল!—বেশ

ভেবে চিন্তে করো। যার জন্যে কোনও দিন অনুতাপ না করতে হয়। আমি অল্প বয়সে, না বুঝে সুঝে এমন একটা বিষম ভুল করে ফেলেছি,—যার জন্যে চিরটী দিন চিরটী জীবন অশান্তি ভোগ করতে হবে।”—এসব কথার মানে কি পিসেমশাই ?”

না না, এতো ভ্রান্তি নয়, কল্পনা নয়,—সত্য,—ধ্রুব সত্য ! দুটী প্রাণে অহরহ একই রাগিণী বাজিতেছে ! দুটী হৃদয় একই সুরে বাঁধা !

যূথিকা ! যূথিকা !—ওগো পুলকের আরাধনার দেবী !—ওগো পাষাণী !—তবে কি তুমি সত্যই পাষাণ গঠিতা প্রতিমা নও ?

তোমার এ একনিষ্ঠ দীন উপাসকের একাগ্র প্রাণের নীরব পূজাটুকু তবে কি তুমি সত্যই গ্রহণ করিয়াছ দেবী ? আহা রে ! আজ সার্থক তাহার জীবনব্যাপী সাধনা !—সার্থক সফল তাহার ব্যর্থ যৌবনের প্রেম স্বপ্ন !

সুরাপায়ীর সুরাপান তৃষার মত পুলকের যূথিকা প্রসঙ্গ শুনিবার নেশা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছিল, আরও কিছু শুনিবার আশায় সে উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিল, “তুমি এখনো ছেলে মানুষ মুকুল ! এসব কথা বুঝবে একটু বড় হলে।—তবে তোমার মা যা বলেন তা বেশ মন দিয়ে শুনো। তিনি বড় বুদ্ধিমতী। হ্যাঁ, আচ্ছা, তোমার মা আর কি কথা বলেন মুকুল ? এখানকার কোনও কথা—”

মুকুল সোৎসাহে বলিল, "ওঃ! এখানকার কথা মা তো প্রায়ই গল্প করেন। এখানে আসতে, একবার সকলকে দেখ্‌তে তাঁর নাকি ভারি ইচ্ছে করে। কিন্তু আসা তো সহজ নয়।—ও পিসেমশাই! তুমি যে তখন গল্প বলবে বলেছিলে? এই সময় বেশ নিরিবিলিতে শুনব, বল না পিসেমশাই একটা গল্প, এর পরে যুঁই এসে গেলে তো আর শুনতে দেবে না।"

পীড়িত বালকের গল্প শুনিবার আগ্রহ দেখিয়া পুলক আর 'না' বলিতে পারিল না,—মনের আকাঙ্ক্ষা মনেই রাখিয়া সে একটা অতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা তবে তাই শোনো।"

পুলক বলিতে লাগিল—"এক দেশে দুটী ছেলে থাকৃত, দুটীতে গলায় গলায় ভাব, যাকে বলে এক দেহ,—এক প্রাণ।"

মাঝখানে মুকুল জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলে দুটীর নাম কি পিসেমশাই?"

পুলক চিন্তিত ভাবে কহিল, "নাম?—ওঃ! তাদের নাম তো আমার মনে নেই!

মুকুল সকৌতুকে হাসিয়া বলিল, "দু'জনের নাম একেবারে ভুলে গেছ পিসেমশাই?—এ গল্প বুঝি তোমার খুব ছোটবেলায় শোনা?"

"তাই হবে।—আচ্ছা ধরে নাও, ছেলে দুটীর নাম অমল

আর অমর। তাদের দুজনে ভারি ভাব, এক সঙ্গে খায় এক সঙ্গে শোয়, এক সঙ্গে বেড়ায়। একটা কোনও জিনিষ পেলে দুজনে আধাআধি ভাগ করে নেয়, তা সে জিনিষ যতটুকুই হ'ক না কেন। ঝগড়া, বিবাদ করতে তারা কেউ একদম জান্‌তো না। আচ্ছা! তারপর একদিন হল কি! তা'রা দুই বন্ধুতে একদিন এমন একটা জিনিষ পেলে যার ভাগ বাটোয়ারা হতেই পারে না।"

"ও পিসেমশাই!"

মুকুল হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, "এ যে আমার শোনা গল্প পিসেমশাই!"

পুলক মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে হ'তেই পারে না, এতো কোনও বইয়ের গল্প নয়, এ গল্প তুমি কক্ষনো শোন নি মুকুল!"

"হ্যাঁ শুনেছি, আমার মা'র কাছে, কিন্তু শেষটা শুনিনি—"

পুলকের বুকের ভিতর আবার ভীষণ আলোড়ন আরম্ভ হইল, ইচ্ছা হইল একবার মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলে, "ওরে মুকুল থাম্ থাম্! মাতালকে সুরাপাত্র দেখাইয়া আর প্রলোভনে পাগল করিয়া তুলিস নারে! এতো সত্যই সুধা নয়! প্রাণ মাতান বুক পোড়ান হলাহল! এ গরল আকণ্ঠ পান করিলে পুলক যে বুক ফাটিয়া মরিয়া যাইবে! সে তো বিষাহারী নীলকণ্ঠ নয়! রক্ত মাংসে

মানব, দেবতার মত অতখানি সহন শক্তি সে পাইবে কোথায় ?

সেই সময় সারদা দুধের বাটি হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিল। মুকুলের গায়ে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া সে আশ্বস্ত কণ্ঠে কহিল, "না! জ্বরটা আর বাড়ে নি তো বরং গা-টা যেন একটু চটচটে বোধ হচ্ছে।"

মুকুল তাহার হাতখানা সরাইয়া দিয়া বলিল, "না ধাই মা! আমি ওবেলার চেয়ে এবেলা ঢের ভাল আছি। তুমি নিজের কাজ করোগে—আমি পিসেমশাইয়ের কাছে গল্প শুনছি।"

"তা শুনো, আগে এই দুধটুকু খেয়ে ফেলো ধন! অনেকক্ষণ খাওনি।"

বহুদিন রোগে ভুগিয়া এই দুগ্ধ পদার্থটীর প্রতি মুকুলের বড় বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ গল্প শুনিবার আগ্রহে সে সমস্তখানি দুধ এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া ফেলিল। তাহারপর স্তম্ভিত পুলকের দিকে চাহিয়া সে মিনতি ভরে কহিল, "বল না পিসেমশাই! শেষটা কি হল? সেই জিনিষটা নিয়ে দুই বন্ধুতে খুব ঝগড়া মারামারি হয়ে গেল বুঝি? সেটা এমন কি জিনিষ, পিসেমশাই! যার ভাগ বাটোয়ারা হ'তেই পারে না?"

পুলক হাত দুখানি বুকের উপর রাখিয়া আহত কণ্ঠে বলিল, "সেটা আমি যে ভুলে গেছি বাবা!"

মুকুল অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "হ্যাঁ—তোমাদের

সব এক কথা! তবে এমন আধ্‌ খাপচা গল্প বলতে এলে কেন? এ গল্পর শেষ মাও জানেন না, আশ্চর্য্য কিন্তু!"

বাহিরের দিকে ঘর্‌ ঘর্‌ করিয়া মোটরের শব্দ হইল, হর্ণ বাজিয়া উঠিল, এবং কয়েক মিনিট পরেই "বাবা! বাবা!" বলিতে বলিতে যুঁই ক্ষিপ্রগতিতে ছুটিয়া আসিল।

পুলকের পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া যুঁই প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "তুমি এখানে বসে বাবা? আর আমি তখন থেকে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—তোমার লাইব্রেরী, বাগান, সব যায়গায় খুঁজে এসেছি—"

মেয়েকে আদর করিয়া পুলক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা যে এত শীগ্‌গির ফিরে এলে যুঁই? তোমার মা কোথায়?"

পিতার সেই আদরটুকুতে আদরিণী কন্যার সমস্ত অভিমান দূর হইয়া গেল। সে হাস্যোজ্জ্বল প্রফুল্ল মুখে বলিল, "মা তো আসেন নি, আমি এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে। উঃ! সেখানে কি ধূমই লেগেছে বাবা! একজন লোক কেমন ম্যাজিক দেখালে। একটী মেয়ের বেনারসী সাড়ীর আঁচলে একরাশ কালি ঢেলে দিলে, কিন্তু কাপড়ে একটুকু দাগ লাগ্‌ল না, সমস্ত কালি কেমন রবারের টুকরো হয়ে গেল! এখন কে একজন মস্ত বড় গাইয়ে এসেছেন, তাঁরই গাওনা হবে, তুমি গান শুনতে ভালবাসো কি না, তাই মুন্‌সেফ বাবু তাঁর ভাইকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলেন তোমাকে নিয়ে যেতে, তাঁরা তোমার জন্যে ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন বাবা! শীগ্‌গির চল!"

পুলক ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া বলিল, "কই তিনি কোথায় ?"

"ঐ যে তিনি মোটরেই বসে আছেন, আমাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন। তুমি চল বাবা। আর দেরি করো না, খপ করে কাপড় ছেড়ে নাও।"

পুলকের ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া সারদা ভরসা দিয়া বলিল, "তুমি নির্ভাবনায় যাও বাবা !—আমি তো মুকুলের কাছে রয়েছি। সেখানে সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন।"

পুলকের সারা মন প্রাণ তখন এক অভিনব উন্মাদনার নেশায় ভরপুর—গান বাজনা শুনিবার জন্য তখন তাহার কিছু মাত্র ইচ্ছা বা আগ্রহ ছিল না, কিন্তু শুধু ভদ্রতার অনুরোধে বাধ্য হইয়াই তাহাকে মুকুলের লোভনীয় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া উঠিতে হইল।

মুকুলের সে জ্বরটুকু পর দিনও ছাড়িল না, অধিকন্তু গলায় ও কাণের পাশে গুটিকতক লাল লাল ঘামাচির মত কি দেখা গেল।

লীলা তাহা দেখিয়া বলিল, "ও কিছু নয় ঘামাচি,—যে ভীষণ গরম পড়েছে, তার ওপর অসুখের জন্যে দুদিন স্নান করানো হয় নি,—ঘামাচি হওয়া তো আশ্চর্য্যের কথা নয়!"

কিন্তু স্ত্রীর অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া পুলক আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না, সে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিতে গাড়ী পাঠাইয়া দিল।

অবিলম্বে ডাক্তার আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "সম্ভবতঃ হাম, বসন্তও হইতে পারে, কেন না, দু চারিটী বড় বড় গুটিও দেখা গিয়াছে।"

উদ্বিগ্ন পুলক ডাক্তারকে বিদায় দিয়া স্ত্রীকে কহিল, "শুন্‌লে তো?—ডাক্তার কি বলে গেলেন? এখন কি করা যায়?—মলয়কে একখানা টেলিগ্রাম করে খবর দেব?"

মুকুলের জন্য যত না হউক, নিজের মেয়েটার জন্য লীলাও অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু সে পুলকের মত উতলা হইল না, একটু ভাবিয়া বলিল, "সেইটেই কি ভুবিধে হবে?—

অতখানি দূর পথ থেকে দাদার আসা তো সহজ ব্যাপার নয়? তার ওপর বউদি যে 'আওপাথালি দুর্গা' ছেলের হঠাৎ অসুখের খবর পেয়ে, তিলকে তাল করে সে আবার কি এক বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে! তা'র চেয়ে আর দুটো দিন থাক,—কি রকম থাকে, দেখে একখানা চিঠিতে সমস্ত কথা খুলে লিখে দিও—আর অত বেশী ঘাবড়াবার তো কোনই কারণ নেই, হাম, বসন্ত তো লোকের প্রায় সচরাচরই হয়ে থাকে,—তবে" লীলা শঙ্কিত স্বরে বলিল, "আমার ভয় হচ্ছে ঐ যুঁইটার জন্যে—যা ছোঁয়াচে রোগ, তায় আবার ছেলেদের পক্ষে—"

এ আশঙ্কা পুলকের মনেও জাগিতেছিল, শুষ্ক চিন্তিত মুখে ত্রস্তে বলিয়া উঠিল, "তাইতো! তাহলে এখন উপায়? আমাদের যুঁইকে কি করে বাঁচান যায় বল দেখি?"

"উপায় এক হ'তে পারে, যুঁইকে নিয়ে আমরা যদি দিন কতকের জন্যে সরে যাই—আলাদা একটা বাড়ী ভাড়া করে—"

"আর মুকুল! তাকে কে দেখবে তা'হলে?"

"মুকুলকে দেখবার ভাবনা কি, সারদা তো আছেই, তাছাড়া আর একজন ন্যর্স রেখে দেব, বাড়ীতে চাকর বাকর আছে, ডাক্তার এসে দুবেলা দেখে শুনে যাবেন, আবার কি চাই?"

পুলকের কিন্তু স্ত্রীর কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল না। সে বিমর্ষ হইয়া বলিল, "সে হয় না লিলি! কোনও মতেই না!"

ঈষৎ বিরক্তির সহিত লীলা বলিল, "কেন হয় না শুনি?"

পুলক একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মলয় কত ভরসা, কত বিশ্বাস করে ছেলেটাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে, আমরা যদি এমন অসময় তাকে ফেলে চলে যাই, তাহলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সেটা ভাল কাজ হবে কি?"

লীলা দ্বিগুণ উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, "তাহলে কি হবে এখন? জেনে শুনে মেয়েটাকে এত বড় উৎকট রোগের কাছে রেখে—"

বাধা দিয়া পুলক বলিল, "তা কেন? মুকুলের কাছে শুধু আমিই থাকি, যুঁইকে নিয়ে তুমি আজই সরে পড়ো—এক-খানা বাড়ীর বন্দোবস্ত আমি এখনি করে দিচ্ছি।"

লীলা খানিক ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু ভাড়াটে বাড়ীতে আমি শুধু চাকর দাসী নিয়ে কি করে থাকব? আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না? যুঁইকে নিয়ে আমি যদি দিনকতক রেণুদের বাড়ী গিয়ে থাকি—তাদের বাড়ীতে তো বিস্তর জায়গা, গঙ্গার ধারে বেশ খোলা জায়গায় বাড়ীখানি।"

"তা থাকতে পারো, কিন্তু ওঁরা রাজি হবেন কি?"

"খুব রাজি হবে! আহা! রেণু তো তাহলে বর্ত্তে যায়! কালই আমাকে ধরে বসেছিল, বলে 'দু চার দিন এখানেই থেকে যা লিলি! তোর সঙ্গে দিনকতক না থাকলে আমার পেটের কথা ফুরোচ্ছে না।' সেখানে শাশুড়ী ননদের মধ্যে ছিল, এমন একা তো কখনো থাকেনি!"

নিরুপায় হইয়া পুলক বলিল, "তবে তাই থাকো।"

"কিন্তু তুমি? তোমার জন্যেও তো ভয় আছে—"

"না, আমার জন্যে কিছু ভয় করো না লিলি! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, মুকুল শীগ্‌গির ভাল হয়ে উঠুক।"

"আহা তাই হ'ক্, ছেলেটা শীগ্‌গির করে ঝেড়ে ঝুড়ে উঠুক, যাদের জিনিস তাদের ফিরিয়ে দিয়ে আমরাও হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচি। তাহলে সেই ব্যবস্থাই করি, রেণুদের জিজ্ঞাসা করে পাঠাই, কেমন?"

"হ্যাঁ, তাই করো।"

"মোদ্দা তুমি খুব সাবধানে থেকো বাপু! এসব রোগ যে সর্ব্বনেশে।"

অবিলম্বে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া, স্বামীকে আত্মরক্ষা সম্বন্ধে বিস্তর উপদেশ দিয়া, লীলা যুঁইকে লইয়া সখীগৃহে গমন করিল।

যুঁই পিতাকে ছাড়িয়া যাইতে প্রথমে কিছুতেই সম্মত হয় নাই; শেষে মাতার তিরস্কার ও পিতার আদর ভরা আশ্বাস বাণীতে শান্ত হইয়া ছল ছল নয়নে, অনিচ্ছায় মাতার সহিত গাড়ীতে উঠিল।

বালিকা কন্যাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়া মন কেমন করিলেও, পুলক অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া রুগ্ন মুকুলের কাছে ফিরিয়া আসিল।

বেচারা মুকুল, তাহার রোগের প্রকৃত বিবরণ জানে নাই,

তাই গাড়ীর শব্দ শুনিয়া সে পুলককে জিজ্ঞাসা করিল, "পিসীমা বুঝি আজও মুন্সেফ বাবুর বাড়ী গেলেন পিসেমশাই ?"

"হ্যাঁ।"

"কখন ফিরবেন ? কালকের মত সেই রাত্তিরে ?"

"না, এখন দু চার দিন ওরা সেইখানেই থাকবে মুকুল !"

"যুঁই ও ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কখন যাবে পিসেমশাই ?"

"আমি তো যাব না। মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী তোমার পিসীমার ভারি বন্ধু কিনা, তাই দিনকতক ওদের নিজের কাছে রাখতে চান।"

বালকের মন উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল। তবে এখন দু চারি দিন তাহার পিসেমহাশয়ের আনন্দময় বাঞ্ছিত সঙ্গ নির্ব্বিবাদে একা উপভোগ করিতে পাইবে! কিন্তু পুলকের চিন্তিত বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া তাহার সে উৎসাহ ও আনন্দ বেশী-ক্ষণ স্থায়ী হইল না।

পিসেমহাশয়ের ম্লান মুখের পানে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া মুকুল সহানুভূতি ভরে কোমল কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু তোমার যে একলাটী বড় কষ্ট হবে পিসেমশাই! একে তো আমাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রয়েছ—"

"না মুকুল! আমার কিছু কষ্ট হবে না। তুমি শিগগির করে সেরে ওঠ দেখি।"

সেদিন এবং পরদিনও মুকুলের সমভাবেই কাটিল। ডাক্তার কিছু আশঙ্কার কারণ প্রকাশ করিলেন না। কি হয় না হয়, অসুখের বিষয় ভাল করিয়া না জানিয়া পুলক মলয়কে সংবাদ দেওয়াটা যুক্তি সঙ্গত বোধ করিল না। যদি ঈশ্বর কৃপায় মুকুলের অসুখ অল্পে অল্পে সারিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পিতামাতাকে সংবাদ দিয়া অনর্থক ভাবাইয়া তুলিবার আবশ্যকতা কি? বিশেষতঃ মুকুলের মা'র যে পুত্রগত প্রাণ!

সতেরো

লীলা চলিয়া যাইবার পর পুলক পীড়িত মুকুলকে নিজ শয়ন কক্ষে স্থানান্তরিত করিয়াছিল। কারণ বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে সেই ঘরখানিতে বায়ু চলাচল অধিক।

আরও দুই দিন দুই রাত্রি অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মুকুলের পীড়ার হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই দেখা গেল না। সেই ঘুষঘুষে জ্বর, মাথায় গায়ে বেদনা। বুকে ও পিঠে আজ আরও কতকগুলি লাল দানা বাহির হইয়াছে, সেগুলি ভালরূপে প্রকাশ হইবার জন্য ডাক্তার ঔষধ দিয়া গেলেন।

পুলক এক আহারের সময়টুকু ভিন্ন আর সমস্তক্ষণই মুকুলের পাশে থাকে।

আন্তরিক যত্ন ও সুশ্রুষা দিয়া পীড়িত বালকের রোগের কষ্ট লাঘব করিতে সে প্রাণপণে চেষ্টিত থাকে।

তাহার আশ্চর্য্য সেবা ও পরমাত্মীয়ের মত স্নেহ মমতা দেখিয়া বাটীর চাকর দাসীরাও বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। সারদা ভাবিল, পুলক মানুষ নহে দেবতা! নহিলে একজন আত্মীয় পুত্রের জন্য কে কবে এতদূর কষ্ট স্বীকার করিতে যায়?

কিন্তু এই কষ্ট ও সেবার বিনিময়ে পুলক মুকুলের কাছে যাহা পাইয়াছিল তাহা একেবারেই অপূর্ব্ব! অপ্রত্যাশিত!

দিবানিশি মুকুলের শয্যা পার্শ্বে থাকিয়া, তাহার মুখে

যূথিকার কথা নিভৃতে ক্রমাগত শুনিয়া শুনিয়া পুলকের কল্পনা প্রবণ মনখানি কি এক অনাস্বাদিত, মধুর অমৃত রসে সিঞ্চিত আপ্লুত হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু সে অমৃত কি সত্যই অমৃত? না বিবেক বুদ্ধি বিনাশকারী তীব্র মদিরা? সে যাই হ'ক্, পুলক এবার আর আপনাকে সাম্‌লাইয়া রাখিতে পারিল না।

স্ত্রী কন্যা বর্জ্জিত নিরালা গৃহে ফাঁক পাইয়া পুলকের সারা জীবনের কামনার ধন যূথিকার চিন্তা দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধির মত তাহার মনে প্রাণে ব্যাপ্ত হইয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ করিয়া তুলিল।

এখন ধ্যানে জ্ঞানে শয়নে স্বপনে সকল সময় শুধু যূথিকার চিন্তা। মুকুলের কাছে পাকে প্রকারে যূথিকার কথা আদায় করাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। সেই প্রিয় প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য তাহার অপরিতৃপ্ত তৃষিত প্রাণ সর্ব্বক্ষণ উন্মুখ হইয়া থাকিত।

সারা দিনমান যূথিকার স্মৃতি যূথিকার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিয়া গভীর নিশীথ রাত্রে, নিভৃত নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যে রোগীর শয্যা পার্শ্বে তন্দ্রা জড়িত নয়নে বসিয়া ভাব বিভোর কবি যখন তাহার কল্পনা লোকের দুয়ার অবারিত মুক্ত করিয়া দিত, তখন যূথিকা, পুলকের ধ্যান ধারণার দেবী প্রেমময়ী যূথিকা, তাহার অম্লান শুভ্র অনুপম রূপরাশি লইয়া, অনবদ্য বিকশিত হৃদয়খানির অনাঘ্রাত মধুময় প্রেম সুরভি লইয়া যেন

সত্যই পুলকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইত, সে যেন তা'র বাঞ্ছিতের কাছে কত সাধিয়া সাধিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মৃদু মধুর গুঞ্জনে বলিত—

—আমি তোমারি—শুধু তোমারি প্রিয়তম! চিরদিন মনে প্রাণে ধ্যানে জ্ঞানে আমি যে শুধু তোমারই উপাসনা করিয়াছি! তবু ক্ষণিকের মোহমায়ায় ভুলিয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করিয়াছি! আমার এ জীবন ভরা ভুল তুমি ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রাণাধিক্!

এমনি করিয়া প্রতি পলে পলে যূথিকার নেশা পুলককে যেন ভূতাবিষ্টের মত পাইয়া বসিল।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। মুকুলকে পুলকের কাছে রাখিয়া সারদা রান্নাঘরে তাহারই জন্য পথ্য প্রস্তুত করিতে গিয়াছিল।

আলোকোজ্জ্বল কক্ষের ভিত্তি সংলগ্ন বিচিত্র রঙ্গীন্ চিত্রগুলি দেখিতে দেখিতে মুকুল জিজ্ঞাসা করিল, "ও ফোটোখানা কার পিসেমশাই?"

"কোন্‌টা?"

"ঐ, ঐ যে তোমার ডানদিকের ছোট ফোটোখানা!"

পুলক তাহার ছোট হাফটোন ফোটোখানি পাড়িয়া মুকুলের হাতে দিল, বলিল, "এ কার ফোটো, তা চিনে বল দেখি?"

মুকুল ফোটোখানি একবার দেখিয়াই বলিল, "বারে! তা বুঝি আমি চিনি না? এ যে তোমারি ফোটো পিসেমশাই!

কিন্তু তোমার তো বেশ বড় ফোটো রয়েছে, তবে আবার এত ছোট করে তুলিয়েছ কেন ?”

“আমি তোলাই নি, এখানা গত বৎসর হুগলী সাহিত্য সম্মিলনীতে তোলান হয়েছিল।”

“ওহো বুঝেছি! এ ছবি তোমার যে আমি আগেও দেখেছি পিসেমশাই ?”

“কোথায় দেখলে ?”

“কি একখানা কাগজে তার নামটা মনে পড়ছে না। সে ছবি অবিশ্যি এত পরিষ্কার ছিল না, কিন্তু চেহারাখানা হুবহু মিলে যায়।”

“কিন্তু তখন তুমি আমায় চিন্‌তে না ?”

“না, কিন্তু মা'র কাছে শুনেছিলুম—মা আবার সেই ছবি কাগজ থেকে কেটে তোমার বইখানাতে লাগিয়ে রেখেছিলেন কি না ?”

অদম্য কৌতূহলের সহিত পুলক অস্বাভাবিক অধীর স্বরে বলিল, “তাই নাকি ? তোমার বাবা দেখে কি বল্লেন ?”

“বাবা বোধ হয় দেখেন নি, তিনি বই টই পড়তে বেশী ভালবাসেন না তো।”

আর কি চাই ? আর তো কোনও সংশয়, কোনও দ্বিধাই নাই!

যুথিকা,—পুলকের চিরদিনের বাঞ্ছিতা যুথিকা, একান্ত তাহারি—চিরদিন তাহারি আছে। তবে সেই যে বিবাহ,

সেওতো মিথ্যা নয়! উঃ! না না, সে এক স্বপ্ন,—নিশীথের তন্দ্রাঘোরে দেখা একটা ক্ষণিকের দারুণ দুঃস্বপ্ন মাত্র!

আনন্দের বিহ্বলতায় পুলকের উচ্ছ্বসিত চিন্তাবেগ সেদিন অদমনীয় হইয়া উঠিল।

ফেনিলোচ্ছ্বল উগ্র মধুর মদির-রসে তাহার হৃদয়-পেয়ালা কানায় কানায় ভরিয়া উপ্‌ছাইয়া পড়িতে লাগিল।

সে রাত্রে মাথার যন্ত্রণা কিছু কম থাকায় মুকুল বেশ ঘুমাইল। কিন্তু যূথিকার চিন্তায় বিভ্রান্ত আত্মহারা পুলক একটুও ঘুমাইতে পারিল না।

সারানিশি বিনিদ্র অতন্দ্র থাকিয়া সে যূথিকাকে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। তাহার সেই কল্প-লোকবাসিনী প্রিয়াকে প্রাণের মধ্যে পাইবার জন্য আজ সে ব্যাকুল অধীর হইয়া উঠিল।—কোথায় তুমি যূথিকা!—কোন্ সুদূর দুস্তর পারাবার পারে বসিয়া অভাগা পুলককে নিরন্তর এমন প্রবল ভাবে আকর্ষণ করিতেছ?—কিন্তু আর দূরে নয়—দূরে নয়! কাছে এসো!—ওগো আমার অন্তরের ধন!—এবার স্বপন লোক ছাড়িয়া তুমি আমার অন্তর লোকে বিরাজ করিতে এসো!—আমার এ প্রেম বিকসিত হৃদয় শতদলে তোমার ওই কোমল-কমল মঞ্জুল চরণ দুখানির পুণ্য পরশ দিয়া আমাকে ধন্য করিতে এসো দেবী!—এ দূরত্ব এ ব্যবধান আর যে সহে না!—ধৈর্য্যহারা ব্যাকুল প্রাণ আর যে ধৈর্য্য মানে না!

এমন করিয়া আর কতদিন,—কতকাল এই চির-তৃষাতুর

উপবাসী চিত্তকে মিলন-আশাহীন চির-বিরহ-আঁধারে ডুবাইয়া রাখিবে প্রিয়তমে ?

মনের দারুণ উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত পুলকের ভাববিহ্বল প্রাণের উচ্ছ্বাস বোধ হয় তাহার অলক্ষ্যে বারকতক মুখেও উচ্চারিত হইয়াছিল, কারণ সারদা সকাল বেলাই ঠাকুরের কাছে গল্প করিয়াছিল, "আহা ! তোমাদের বাবুর কি মায়ার শরীর বাপু !—সবে দুটীদিন মেয়ে চক্ষের অন্তর হয়েছে, অমনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও সারারাত কেবল 'যূথিকা তুমি কোথায় ?'—'যূথিকা তুমি কাছে এসো,'—খালি এই করছেন ! পুরুষ মানুষের এত নরম মন তো কখনো দেখিনি !"

সেই দিন বৈকালে মলয়ের একখানা টেলিগ্রাম আচম্বিতে আসিয়া পুলককে আরও বিহ্বল বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

মলয় লিখিয়াছে, "যূথিকা পুত্রের জন্য বড়ই উতলা হইয়া পড়িয়াছে, সেজন্য বাধ্য হইয়াই তাহাকে সরকার মহাশয়ের সঙ্গে ওখানে পাঠাইতেছি। বাইশে যে তারিখে সে কলিকাতায় পঁহুছিবে।"

পুলক শিহরিয়া উঠিল। একি বিচিত্র অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার !

যাহার উতলা হইবার আশঙ্কায় পুলক মুকুলের অসুস্থ বার্ত্তা ঘুণাক্ষরেও জানায় নাই, সেই যূথিকা আজ প্রাণের টানে আপনিই আসিতেছে ! মাতৃহৃদয় কি সত্যই অন্তর্য্যামী ?

একান্ত অপ্রত্যাশিত আনন্দের প্রবল আবেগ কম্পনে

পুলকের সমস্ত শরীরের প্রত্যেক শিরা উপশিরায় উষ্ণ শোণিতোচ্ছ্বাস দ্রুততালে নৃত্য করিয়া উঠিল।

সে আসিতেছে!—কল্পনা নহে। স্বপ্ন নহে এবার সে সত্যই আসিতেছে!

ভক্ত প্রাণের একাগ্রতা ভরা আকুল আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া,—তাহার বিমুখ ধ্যানের দেবী, প্রাণময়ী বরদাত্রীরূপে প্রত্যক্ষে দেখা দিতে আসিতেছে!—যূথিকা,—পুলকের চিরজীবনের অভীপ্সিতা প্রেয়সী যূথিকা,—যাহাকে সে একদিন নিজের সমস্ত সত্ত্ব দিয়া, প্রাণ মন লুটাইয়া অন্ধভাবে ভালবাসিয়াছিল, এবং এখনো ভালবাসে,—চিরদিন চিরজীবন যাহাকে ভালবাসিবে, সেই যূথিকা আজ আসিতেছে,—তাহারই কাছে, তাহারই শূন্য মন্দিরে—তাহারই নিরানন্দ ব্যর্থ জীবনে মিলনের নিবিড় আনন্দ ঢালিয়া সার্থক করিয়া তুলিতে!—তবে আর বাকি কি?

ওরে পুলক!—ওরে ভাগ্যবান পুলক!—তোর সব পাওয়া জীবনে আর বাকি কি রহিল?

পুলকের সর্ব্বান্তকরণ বিপুল উল্লাসে সাড়া দিয়া উঠিল এবার সে আসিতেছে রে। তোর প্রাণের পূজা লইতে সে আসিতেছে!

কিন্তু সত্যই কি তাই?—যে আসিতেছে সে পুলকের কে? সে আসিতেছে কেন?—কাহার জন্য?

পুলকের বন্ধুপত্নী আসিতেছে সন্তানের দর্শন কামনায়,

মা আসিতেছে ছেলের কাছে!—ইহাতে পুলকের কি?—কিছু নয়! কিছু নয়!

এই তুচ্ছ ঘটনায় তবে সে এমন করিয়া আপ্সাইয়া মরিতেছে কেন?

এমনি দ্বিধায়—সঙ্কোচে, আনন্দে, আবেগে পুলকের বিপর্য্যস্ত অধীর-চিত্ত ঝড়ের মুখে আন্দোলিত উন্নত বৃক্ষচূড়ার ন্যায় একবার এদিকে একবার ওদিকে সবেগে, সঘনে দুলিতে লাগিল।

উদ্‌ভ্রান্ত দিশাহারা হইয়া পুলক মনে মনে বলিল, "ভগবান! ভগবান! অভাগাকে আজ আবার একি দুর্জ্জয় প্রলোভন একি কঠোর পরীক্ষায় ফেলিলে প্রভু!"

সম্মুখে সুশীতল স্নিগ্ধ বারিপাত্র রাখিয়া, প্রাণের ভিতর চির শুষ্ক মরুর ভীষণ তৃষা লইয়া, পলে পলে, তিলে তিলে বুক ফাটিয়া মরিতে হইবে, ইহাই কি তাহার ভবিতব্য? হায়! নিষ্ঠুর নিয়তি!

কিন্তু সেই রাত্রে মুকুলের জ্বরটা সহসা বৃদ্ধি পাইয়া পুলকের চিন্তার স্রোত ভিন্ন পথে পরিচালিত করিল।

পুলক ভীত হইয়া সিবিল সার্জ্জনকে ডাকিয়া দেখাইল, তিনি দেখিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন। বসন্তের গুটিগুলি সম্ভবতঃ ভিতরে বসিয়া গিয়াছে, সুতরাং রোগীর অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নহে।

আঠারো

"পিসেমশাই !"

"কি বাবা ?"

"বাইশ তারিখ কবে পিসেমশাই ?"

"পরশুদিন,—পরশু তোমার মা'র কলিকাতায় পৌঁছিবার কথা।"

"পরশু ?—তাহলে আর তো দেরি নেই !"

মাতৃমিলনের আশু সম্ভাবনায় রুগ্ন বালকের বিবর্ণ পাংশুমুখে আনন্দের রক্তিমা জাগিয়া উঠিল।

রক্তলেশহীন শুষ্ক ওষ্ঠাধরে তৃপ্তির হাসি চকিতে খেলিয়া গেল। উল্লাসে অধীর হইয়া সে বলিল, "পরশু !—আঃ !—পরশু কতক্ষণে আসবে পিসেমশাই ?"

বালকের হর্ষদীপ্ত জ্বরতপ্ত মুখখানি গভীর মমতায় চুম্বন করিয়া পুলক সস্নেহ হাস্যে কহিল, "আমার মুকুল মণির আর 'ত্বর' সইছে না যে ! কিন্তু পরশু সকালেই যে আমাকে কলিকাতায় যেতে হবে, সরকার মশাই বুড়ো মানুষ, হয়তো গুছিয়ে নামাতে পারবেন না—এদিকে তোমাকে কা'র কাছে রেখে যাব, তাই ভাবছি মুকুল !"

মুকুল পরমোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "তা হ'ক্‌ না, একবেলা বইত নয় ? সে সময়টুকু আমি ধাই মার কাছে বেশ থাকব 'খন;

তা'র জন্যে তোমায় কিছু ভাবতে হবে না পিসে মশাই। তবে—"

মনে মনে দিন, রাত্রি ও ঘণ্টার হিসাব করিতে করিতে মুকুল উৎকণ্ঠিত অধীর স্বরে বলিল, "এই আজকের রাতটুকু, তার পর কালকের গোটা দিন, গোটা রাত, তিন বারোং ছত্রিশ ঘণ্টা, তার পর এখানে পৌঁছুতে যা সময় লাগে—ওরে বাবা!—এখনো যে ঢের দেরি পিসে মশাই!"

"কিছু দেরি নেই!"

মুকুলের জ্বরতপ্ত ললাটের রুক্ষ এলোথেলো চুলগুলি গুছাইয়া দিতে দিতে পুলক স্নেহ গাঢ় কণ্ঠে কহিল, "দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে মুকুল! কিন্তু এর মধ্যে তুমি একটুখানি সেরে ওঠ, নইলে তোমার মা কি মনে করবেন বল দেখি? তিনি কত আশা নিয়ে তোমাকে দেখ্‌তে আসছেন, এত দূর থেকে—"

"তুমি আমার অসুখের কথা বুঝি 'মা'কে লিখেছিলে পিসেমশাই?"

"না"

"তবে মা কি করে টের পেলেন?"

"মা'র মন যে অন্তর্য্যামী বাবা!"

"তাই তো দেখ্‌ছি। আচ্ছা পিসে মশাই!"

মুকুল বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। পুলক সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌ছিলে মুকুল?"

মুকুল একটী ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, "যদি আমাকেও কলিকাতায় নিয়ে যেতে পারতে—তা বুঝি হয় না পিসে মশাই?—হ'লে বেশ হ'ত কিন্তু! তা হলে মা জাহাজ থেকে নেবেই আমাকে কোলে তুলে নিতেন!"

মাতৃদর্শনাকাঙ্ক্ষা অধীর বালকের এই কাতর ব্যাকুলতা পুলককে বিচলিত করিয়া তুলিল।

সে মুকুলকে প্রবোধ দিয়া স্নেহ কোমল কণ্ঠে কহিল, "তুমি ভাল থাকলে তো তাই নিয়ে যেতুম মুকুল! কিন্তু এই অসুখ এই দুর্ব্বল শরীরে তোমায় কি করে নিয়ে যাই বল? তুমি তো বুদ্ধিমান ছেলে, সবই বোঝো বাবা! তা'র চেয়ে একটু ধৈর্য্য ধরে এখানেই থেকো, লক্ষ্মীটী! আমি তোমার মাকে নামিয়ে নিয়ে সোজা এইখানেই এসে উঠব। কলিকাতায় এক মুহূর্ত্তও দেরি করব না।"

পরদিন মুকুলের পীড়া আরও বৃদ্ধি হইল। জ্বরের প্রাবল্য, শিরঃপীড়া, গাত্রদাহ, বালককে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল।

নিদারুণ দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কায় পুলক একেবারে অবসন্ন বিমূঢ় হইয়া পড়িল। মনের সে বিপর্য্যস্ত অবস্থায় রোগীর পরিচর্য্যা হওয়া অসম্ভব, সুতরাং মুকুলের জন্য পুলক একজন অভিজ্ঞা নার্স নিযুক্ত করিয়া দিল।

সে রাত্রি মুকুলের প্রায় অঘোর অবস্থায় কাটিল। প্রভাতে সংজ্ঞা লাভ করিয়া মুকুল চক্ষু মেলিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল, "আজই তো বাইশ তারিখ, না পিসেমশাই?"

বালকের প্রভাত তারকার মত দীপ্তিহীন পরিম্লান মুখখানি গভীর স্নেহে চুম্বন করিয়া পুলক আর্দ্র স্বরে গাঢ়কণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ, আজই বাইশ তারিখ, তুমি এখন কেমন আছ মুকুল মণি?"

মুকুল দুর্ব্বলতার ক্ষীণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে বলিল, "ভাল আছি,—কাল আমি সমস্ত রাত খালি মাকেই স্বপ্ন দেখেছি, পিসে মশাই! বাড়ী থেকে আসবার সময় তাঁকে যেমনটী দেখেছিলুম, সেই চাঁপাফুলের রংয়ের সাড়ীখানা পরা, এলো করা চুল, ছুটে এসে যেন আমাকে কোলে তুলে নিয়েছেন, কত আদর করে বলছেন, 'মুকুল! এইবার তুই ভাল হয়ে যাবি খন! তোকে ভাল করতেই যে আমি তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি!' কিন্তু এবার আর তাঁর চোখে জল ছিল না পিসে মশাই,—ছিল মুখভরা হাসি!"

বালকের স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া পুলক স্মিত মুখে বলিল, "তোমার স্বপ্ন মিথ্যে নয় মুকুল, আজ যে সত্যি তোমার মা আসছেন।"

"হ্যাঁ, তাতো জানি, কিন্তু তুমি মাকে আনতে যাবে কখন পিসে মশাই?—সকাল তো হয়ে গেছে, এই বেলা যাও না! আমি এখন বেশ ভাল আছি।"

মনের আনন্দে ও উৎসাহের উত্তেজনায় পীড়িত দুর্ব্বল বালক তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া বসিল।

পুলক তাহাকে শান্ত করিয়া সযত্নে শোওয়াইয়া দিল।

তাহার পর রোগী সম্বন্ধে নার্সকে কয়েকটী উপদেশ দিয়া, সারদাকে বিশেষ সাবধানে থাকিতে বলিয়া পুলক যূথিকাকে আনিতে কলিকাতায় যাত্রা করিল।

উনিশ

যাত্রীদের গমনাগমনে জাহাজের কাঠের সিঁড়িখানি ক্রমাগত কাঁপিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল, সঙ্গে তাহার চেয়েও জোরে দুলিতেছিল পুলকের হর্ষ-বিষাদ আশা-নিরাশায় আন্দোলিত প্রতীক্ষমান অশান্ত চিত্তখানি।

প্রত্যেক যাত্রীর প্রতি পদক্ষেপের শব্দ সচকিত হইয়া সে ক্ষণে ক্ষণে সিঁড়ির দিকে আগ্রহ ভরা সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেছিল, কিন্তু যূথিকা কোথায়?—তাহার তো চিহ্নমাত্রও নাই!

শেষে হতাশ অধৈর্য্য হইয়া পুলক জাহাজের কাপ্তেনের সহিত সাক্ষাৎ করিল। যূথিকার কথা জিজ্ঞাসা করিতে তিনি একটু আশ্চর্য্যভাবে কহিলেন, "তাঁহাকে কি এখনো নামানো হয় নাই?"

পুলক অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া ত্বরিতে জিজ্ঞাসা করিল, "না তিনি কোথায়?"

সহানুভূতির চক্ষে একবার পুলকের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কাপ্তেন সাহেব গম্ভীর মুখে কহিলেন, "মিসেস্ দত্ত কি আপনার বিশেষ আত্মীয়া?"

"হাঁ মহাশয়! তিনি আমার কাছেই আসিতেছেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়; আজ প্রথম সাক্ষাতেই মিসেস

দত্তকে তাঁ'র এক মাত্র প্রিয় সন্তানের অসুখের সংবাদ—"

"ওঃ! তা'র জন্য ভাবনা নাই বাবু!"

কাপ্তেন বিমর্ষভাবে দুঃখিতস্বরে বলিলেন, "বড় দুঃখের বিষয়, আপনার আত্মীয়া এখন এ জগতের সমস্ত সুখ ও অসুখের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন—"

পুলক এই অতর্কিত নিদারুণ দুঃসংবাদে বজ্রাহতের মত চমকিয়া উঠিয়া আহত আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "সে কি কথা? তিনি কি তবে—"

কাপ্তেন উদাসভাবে দুঃখের সহিত জানাইলেন, "এখানে পৌঁছিবার প্রায় তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে মিসেস্ দত্তর হৃদ্‌রোগে আকস্মিক মৃত্যু হইয়াছে। জাহাজে উঠিবার সময় তাঁহার শরীর বেশ ভালই ছিল, কিন্তু গত রাত্রি হইতে হঠাৎ বক্ষের মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, জাহাজের ডাক্তার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে পারিলেন না। হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও মনের অস্বাভাবিক আকস্মিক উত্তেজনাই নাকি তাঁহার এই শোকাবহ মৃত্যুর কারণ। মিসেস্ দত্তর পথের সঙ্গী সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী এই অভাবিত দুর্ঘটনায় এতই কাতর ও মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহার দ্বারা কিছুমাত্র সাহায্যের প্রত্যাশা করা চলে না। মৃতার দেহ এখনও তাঁহার কামরায় সযত্নে রাখা আছে।"

হা ভগবান্! একি?—একি করিলে প্রভু! একি স্বপ্ন

নয়, ভ্রান্তি নয়—সত্য ঘটনা ?—উঃ এ যে সত্য! একেবারে নির্ঘাত নিষ্ঠুর সত্য!

গভীর অবসাদক্লিষ্ট মূর্চ্ছাহত দেহ মন লইয়া পুলক যন্ত্রচালিতের মত তাহার তখনকার কর্ত্তব্যগুলি শেষ করিল, যন্ত্রচালিতের মত তাহার চির আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়ার পরিত্যক্ত দেহখানি তীরে নামাইল,—তাহার পর ?

ওঃ! কত দিন কত কাল পরে আজ সাক্ষাৎ! কিন্তু কি অভাবনীয় অপ্রত্যাশিতরূপে,—কি মর্ম্মান্তিক নিদারুণ অবস্থায়!

হায়! যূথিকা!—যূথিকা অভাগার জীবন সর্ব্বস্ব ধন যূথিকা!—সে যে বড় আকাঙ্ক্ষা বড় ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া এতদিন সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া তোমাকেই আহ্বান করিয়াছে,—তাই বুঝি আজ এই বুকভাঙ্গা বজ্রবেদনার মধ্যে, মর্ম্মবিদারী তপ্ত অশ্রু জলে, তাহাকে শেষ দেখা দিতে আসিলে তুমি ?

জীবনে এ মিলন অসম্ভব,—তাই কি মরণের সদা মুক্ত অবারিত পথ দিয়া তোমার এ চিরদিনের বঞ্চিত প্রেমিককে অবিচ্ছেদ্য নিবিড় মিলন পাশে বাঁধিয়া রাখিয়া শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছ দেবী ?

* * * * *

সে অফুরন্ত অনবদ্য রূপরাশির বুঝি মরণেও শেষ নাই! যূথিকার জীবনহীন নিস্পন্দ দেহখানির প্রত্যেক অঙ্গে, অঙ্গে তখনও কি অনুপম মাধুরী কি সৌন্দর্য্য সুষমা ঝরিয়া পড়িতেছিল!

দীর্ঘ পক্ষ্ম বিশিষ্ট আয়ত আঁখি পাতা দুখানি কি মধুর-ভাবে কি গভীর প্রশান্তিতে নম্র,—অবনমিত ! বাসি ফুলের পাপড়ীর মত সুন্দর বিরস ঈষৎ বিভিন্ন ওষ্ঠাধরে সেই চিরমধুর প্রাণ মাতান হাসিটুকু যেন তখনও লাগিয়া আছে !

আজ সে যেন তাহার হৃদয় ভরা অনুরাগ লইয়া সত্যই তাহার চিরদিনের ঈপ্সিত পুলককে মিনতি করিয়া বলিতেছে, "আমাকে ক্ষমা কর প্রিয়তম !—আমার জীবন ভরা ভুল তুমি ক্ষমা করো !"

বেদনার্ত্ত আহত বক্ষ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া পুলক কতক্ষণ অশ্রু সজল নির্ণিমেষ নয়নে যূথিকার সেই বাত্যা-বেগে ঝরিয়া পড়া যূথিকা-কুসুমের মত পরিম্লান করুণশ্রী প্রাণ ভরিয়া জন্মের শোধ দেখিয়া লইল।

সেই প্রাণপ্রতিমার প্রাণবিহীন নিথর দেহখানির উপর লুটাইয়া পড়িয়া একবার সাধ মিটাইয়া কাঁদিবার জন্য সে দেহের মৃত্যু শীতল স্নিগ্ধ পরশটুকু একবার এই প্রথম ও শেষবার—সারা দেহ মনে মাখিয়া লইবার জন্য পুলকের বিভ্রান্ত তৃষিত মনে তখন একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা, প্রমত্ত বাসনা কেবলই জাগিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু হায়রে দুরদৃষ্ট ! অভাগা পুলকের সেই অন্তিম সাধ, শেষ আকাঙ্ক্ষাটুকুও নিবৃত্তি করিবার যে উপায় নাই ! যূথিকা যে তাহার বন্ধুপত্নী,—পরস্ত্রী,—জীবিতে হউক

আর মৃতেই হউক, সে দেহ স্পর্শ করিবে পুলক কোন্ অধিকারে ?

তবে কেন এ ভ্রান্তি, কেন এ মরীচিকার মোহ ? সহনাতীত বেদনায় বিহ্বল মোহাবিষ্ট পুলককে সজাগ সচেতন করিয়া দিয়া সরকার মহাশয় সরোদনে কহিলেন, "আর কেন বাবা ? এইবার এ স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন দেবে চল ! আহা হা ! মাগো আমার ! কেবল মুকুল মুকুল করে' মুকুলকে দেখ্‌তে এসেই শেষে জীবন দিলে ! তবু একবারটী শেষ দেখাও দেখতে পেলে না !"

বৃদ্ধের সেই কাতর আক্ষেপোক্তিতে পুলকের বিভ্রান্ত প্রাণের মূর্চ্ছিত বিবেক বুদ্ধি পুনরায় জাগ্রত হইয়া উঠিল। চকিতে মনে পড়িল পীড়িত মুকুলের কথা,—আহা বেচারা মুকুল ! অভাগা মুকুল ! সে যে বড় ব্যাকুল আগ্রহে তাহার স্নেহময়ী মায়ের আশাপথ চাহিয়া রোগ শয্যায় পড়িয়া আছে ! পুলক এখন এত বড় দুর্ব্বিসহ আঘাত তাহাকে কেমন করিয়া দিবে ? মাতৃহীন অবোধ বালককে সে এখন কেমন করিয়া, কি বলিয়া সান্ত্বনা দান করিবে ?

পুলক বক্ষের উপর পাষাণ চাপাইয়া তাহার বিপর্য্যস্ত মনকে কর্ত্তব্য পথে টানিয়া আনিল।

সকলেই পরামর্শ দিলেন মৃতদেহের সৎকার সেইস্থানেই করা হউক, কিন্তু পুলক সে প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিল না।

যূথিকা—তাহার জীবনের জীবন যূথিকা, সে যে এতদিন

পরে কত আশা আগ্রহ লইয়া স্বেচ্ছায় আসিতেছিল তাহারই ঘরে, জীবনে হউক, মরণে হউক, তাহার সে সাধ পুলক পূর্ণ করিবে।

তাহার শূন্য গৃহমন্দিরে এই জীবনহীন প্রতিমাকে একবার প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনের সাধে, তাহার চির পিয়াসী,—চির উপবাসী,—অতৃপ্ত প্রাণের ব্যথার পূজা সমাপন করিবে। একবার বুকফাটা আকুল অশ্রুজলে তাহার প্রথম ও শেষবার প্রেমের আরতি করিয়া লইবে—তাহার পর বিসর্জ্জন তো আছেই!

প্রাক্তনের খেলা! যূথিকা তাহার চির প্রণয়াস্পদের গৃহে আজ যে এমনিভাবে, প্রথম ও শেষবারের মত অতিথি হইতে আসিবে, তাহা কে ভাবিয়াছিল?

পুলকের গাড়ী গেটের ভিতর ঢুকিতেই সারদার মর্ম্মবিদারী আর্ত্ত হাহাকার শোনা গেল—

"ওরে মারে! তুই অতদূর থেকে আজ কাকে দেখ্‌তে এলি রে মা?—তোর বুকের ধন মুকুলকে আর যে কিছুতেই ধরে রাখ্‌তে পারলুম না রে!"

পুলক আর একবার চমকিয়া, শিহরিয়া উঠিল। তবে কি মুকুলও আর অপেক্ষা করিতে পারিল না? স্নেহময়ী জননীকে মৃতা দেখিবার আশঙ্কায় সে কি পূর্ব্বেই পলাইয়া গিয়াছে?

হায় রে! যূথিকা যাইবার সময় তাহার শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকুও কি নিঃশেষে মুছিয়া লইয়া গেল?

এ পাপ তাপপূর্ণ নিষ্ঠুর সংসার সেই অপাপবিদ্ধ মাতা-পুত্রের যোগ্য স্থান নহে, তাই বুঝি দয়াময় বিশ্বপতি নিষ্কলঙ্ক শুভ্র আত্মা দুটাকে এই মহামিলনের পথ দিয়া তাঁহার চির-শান্তিময় পবিত্র চরণাশ্রয়ে ডাকিয়া লইলেন?

সব ফুরাইয়া গেল!—মূর্চ্ছাতুর পুলকের অশ্রুআর্ত্ত, নিমেষ-হারা নয়ন সম্মুখে তীব্র জ্বালাময় জ্যোতিঃশিখা বিচ্ছুরিত করিয়া ধূ ধূ জ্বলন্ত চিতানল মহানিদ্রায় নিদ্রিত মাতাপুত্রকে নিঃশেষে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ইহজগতের সমস্তই ফুরাইল!

কেহ জানিল না, কেহ শুনিল না, নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ ঘনিষ্ঠ হৃদয় দুখানি চিরদিন পরস্পরের কাছে অজ্ঞাত অপরিচিত রহিয়া গেল,—দুটী অপরিতৃপ্ত ব্যথিত প্রাণের নীরব গোপন প্রেমের পবিত্র 'ফল্গু-ধারা' চিরদিন নীরবেই বহিয়া গেল,—কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না!

* * * *

সংসার চক্র যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল।

লীলা তাহার ঘর দুয়ার পরিষ্কৃত, পরিমার্জ্জিত করিয়া পুনরায় গৃহধর্ম্মে মন দিল।

বালিকা যুঁই আবার একলা ঘরের দুলালী হইয়া তাহার স্বল্প কয়েকদিনের পরিচিত ক্ষুদ্র সঙ্গীটীর অস্পষ্ট স্মৃতি চিহ্নাঙ্কিত উদ্যানটীতে পূর্ব্বের মত হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শোকার্ত্তা সারদা মনের দুঃখে সঞ্চিত অর্থ লইয়া কাশী-বাসিনী হইল।

সর্ব্বোপরি মলয়,—আদর্শ-পত্নী-প্রেমিক মলয়, স্ত্রীপুত্রের অসহনীয় নিদারুণ বিয়োগ ব্যথা ভুলিবার জন্য পুনর্ব্বার আর এক সুন্দরী ষোড়শীর সহিত নূতন উদ্যমে 'কোর্টশিপ্' আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু পুলক ?

কত জ্যোৎস্নাময়ী মধু যামিনীতে চুঁচুড়ার শ্মশানভূমির পার্শ্বস্থ পথের পথচারীরা দেখিতে পাইত, যেখানটীতে যূথিকা ও মুকুলের নশ্বরদেহ ভস্মীভূত করা হইয়াছিল, সেই স্থানে, কে একজন মৌন বিষাদ ও গভীর শোকের প্রতিমূর্ত্তির মত নীরবে ধীরে ধীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে !

কত আঁধার ভরা নিঝুম সন্ধ্যায় তাহারা চমকিত হইয়া দেখিত কাহার একখানি স্তব্ধ ম্লান ছায়া অশরীরী আত্মার মত নীরবে জাগিয়া আছে ! তাহারা কতবার উৎকর্ণ মুগ্ধ হইয়া শুনিত সেই বিজন শ্মশানভূমির শব্দহীন প্রগাঢ় নিস্তব্ধতাকে গভীর ব্যথায় স্পন্দিত করিয়া কে মৃদুমধুর করুণ সুরে গাহিতেছে—

"জীবনে যত পূজা
হ'ল না সারা
জানি গো ! জানি তা'ও
হয়নি সারা।"

মাস দুই পরে একদিন পুলক তাহার বন্ধু মলয়ের নিকট হইতে আবার একখানি পত্র পাইল। সে লিখিয়াছে—

ভাই পুলক!—

তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, কি অসুখী হইবে বলিতে পারি না,—কিন্তু আমি আবার বিবাহ করিয়াছি। এ সংবাদে হয়তো তুমি চমকিয়া উঠিবে, আমাকে নিষ্ঠুর অপ্রেমিক বলিয়া গালি দিবে, কিন্তু আমি এখন কি করি ভাই? সংসারে থাকিতে গেলেই যাহোক্ একটা অবলম্বন চাইতো?

তোমার মত কল্পনা প্রিয় কবি হইলে হয়তো যুথিকার স্মৃতি-মাত্র সম্বল করিয়া চিরজীবন কাটাইয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি তাহা নই। অতি সাধারণ বাস্তব জগতের লোক আমি, শুধু কবিত্ব ও মৃতা প্রিয়ার শোকস্মৃতি লইয়া বসিয়া থাকাতো আমার পক্ষে সম্ভব নয়!

তাই আমার শোকার্ত্ত নিরলম্ব জীবনের এবং গৃহিণী শূন্য সংসারের বিরাট অভাব পূর্ণ করিবার আশায় 'দীপ্তি'কে লইয়া আসিয়াছি।

সে আশা আমার আশাতীতরূপে সফল হইয়াছে। প্রেমময়ী দীপ্তি ইহারই মধ্যে আমার হাহাকার ভরা হৃদয়খানির সকল শূন্যতা, পরিপূর্ণ প্রেমে সোহাগে, ভরাট করিয়া তুলিয়াছে। সে আমাকে বাস্তবিক সুখী করিয়াছে।

তুমি হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে, 'যূথিকা বুঝি তোমায় ভালবাসিত না?' তা বাসিত বই কি? কিন্তু সে এমন প্রাণ মন দিয়া, নিজের নিজস্ব বিলাইয়া নহে। তাহাকে আমি এমন পরিপূর্ণভাবে, অন্তরের এত কাছে কখনও পাই নাই। একটা কিসের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান তাহাকে আমার কাছ হইতে চিরদিন তফাৎ করিয়া রাখিয়াছিল। বলিতে পারি না এ ধারণা আমার অভ্রান্ত কি না।

তবে এটা ঠিক্ জানি, সে তা'র মুকুলকেই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ভালবাসিত, তাই তাহারই কাছে চলিয়া গিয়াছে, সেজন্য আর আক্ষেপ করা বৃথা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়

"চুঁচুড়ার কিনারায় যাঁর পীঠস্থান
হৃদয় ক্ষীরের খনি আকারে পাঠান।
হাঁসারঙা খাসা বুড়ো মাথা জ্ঞানগুড়ে
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে।
ইংরাজী শিক্ষার ফুল বাঙ্গালী শিকড়ে
স্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চূড়ে।
তর্কেতে তক্ষক যেন তেজে তেজপাতা
শিক্ষাব্রত সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা।
বচন বটের ফল ধীরে ধীরে পড়ে
দেশের দোছোট বটো—মোদ্দা কথা গড়ে
ধনে মানে কুলে যশে পদে পাকা তাল
সেকালের মাঝে এক সুন্দর প্রবাল।
নবগ্রহ পূজাকালে আগে যার ভাগ
দেখো হে পুতুল রাজা বাঙ্গালীর বাঘ।"

৺ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

"সুভব্য ভূদেব-বিজ্ঞ পণ্ডিত সুজন।
গুরু-মহাশয়-গুরু শুভ-দরশন॥
বঙ্গদেশ সাহিত্যের উন্নতি সাধক।
কাটিছেন সযতনে অজ্ঞান কণ্টক॥" ৺ দীনবন্ধু মিত্র।

বঙ্গীয় গগনের গৌরবরবি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বঙ্গ সাহিত্য ও সমাজের শিক্ষাগুরু, প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় নূতন করিয়া বাঙ্গালীকে দিতে হইবে না। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের আদিযুগে বঙ্গদেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শে যখন দারুণ সংঘর্ষ বাঁধিয়াছিল, পরধর্ম্মের বিপুল মোহে স্বধর্ম্ম যখন বাঙ্গালীর চোখে নিতান্তই দরিদ্র, ম্লান বলিয়া অনুভূত হইতেছিল, দেশের দুর্দ্দিনে যখন শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই বিজাতীয়ভাবের অনুকরণে বিভোর হইয়াছেন, শিক্ষিত বাঙ্গালী যখন বাঙ্গালা জানেন না বলিতে গৌরব বোধ করেন, সেই শঙ্কট সময়ে চরিত্রের অটল মহিমায় প্রতিভার অম্বর দীপ্তিতে যিনি জাতীয়তার বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়াছিলেন— আমাদের আচার, নীতি, আদর্শের গভীর মহিমা সুদৃঢ় যুক্তির সহায়তায়

বঙ্গবাসীকে বুঝাইয়াছিলেন ;—ভারতে নবযুগের আদি প্রবর্ত্তক, স্বদেশী-মন্ত্রের আদি পুরোহিত, শক্তিশালী বাঙ্গালীর পবিত্র রচনাবলী বাঙ্গালী হইয়া যিনি না পড়িলেন, তাঁহার বাঙ্গালী জীবনই বৃথা হইল। আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ গৃহস্থ, আদর্শ দেশভক্ত এবং আদর্শ জ্ঞানীর এরূপ একত্র সমাবেশ জগতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। শিক্ষার প্রচার, সমাজের উন্নতি এবং জাতীয় গৌরবের স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি জীবনপাত করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার আজীবনের সঞ্চয় হইতে একলক্ষ বাটি হাজার টাকা শিক্ষা লোকহিতার্থে ও আর্ত্তের সাহায্যে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা, সমাজ, আচার বিষয়ক পুস্তকাবলী, তাঁহার সাহিত্য বিষয়ক মধুর সমালোচনা, তাঁহার 'পুষ্পাঞ্জলি', 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালার গৌরবের বস্তু। তাঁহার অলোক-সামান্য প্রতিভা, স্বজাতি প্রীতি, অপূর্ব্ব চরিত্র, উদার বিচার বুদ্ধি তাঁহাকে স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্ব-পূজ্য করিয়াছে। তিনি রাজকীয় সি, আই, ই, উপাধি পাইয়াছিলেন, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন, বঙ্গবিহারের স্কুল পরিদর্শকরূপে বহু কৃতীত্ব দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু এ সমস্ত তাঁহার গৌরব নহে। তাঁহার গৌরব তিনি স্বজাতিকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন, দেশে একতা আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বিহার প্রদেশের আদালত সমূহে হিন্দিভাষা প্রচলন প্রবর্ত্তন করাইয়াছিলেন। সামাজিকতায় হিন্দুমুসলমান খৃষ্টানে যিনি কোন দিন ভেদ করেন নাই—ঋষির তুল্য নৈষ্ঠিক, জ্ঞানী ভূদেবের জ্ঞানের ফল অমূল্য গ্রন্থরাজি বাঙ্গালী পঞ্জিকার মত গৃহে গৃহে রক্ষ করুন। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা হউক।

ভূদেব পাবলিসিং হাউস,

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকার, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা, সুন্দর স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধাই, মূল্য ১৸০ (এক টাকা বার আনা)।

——:•:——

সামাজিক প্রবন্ধ।

ভারতের নবযুগ-প্রবর্ত্তক এই গ্রন্থপাঠ না করিলে কাহারও শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। আত্ম-কল্যাণকামী প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহা পাঠ করিবেন। এই মহামূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে দেশে এক নবভাবের উদ্দীপনা জাগিয়াছিল। একটী মাত্র সমালোচনা পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এসিয়াটিক সোসাইটীর রিপোর্টে সার চার্লস ইলিয়ট লিখিয়াছিলেন—"এ দেশে আর একখানিও পুস্তক নাই যাহাতে—"সামাজিক প্রবন্ধের" ন্যায় এতটা পাণ্ডিত্য এবং এতটা বহুদর্শিতা একত্রে আছে। প্রগাঢ় প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য বিদ্যার সমবায়ে সমুৎপন্ন।"

ভারতবর্ষে মুসলমান, হিন্দু সমাজ, ইংরাজ সমাগম, ইউরোপের কথা, ভারতবর্ষের কথা, নেতৃপ্রতীক্ষা, কর্ত্তব্য নির্ণয়, ভবিষ্য বিচার, জাতীয়ভাব সম্বর্দ্ধনের পথ প্রভৃতি ৩৯টী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ইহাতে আছে। ইংরাজ প্রদত্ত ডাক, রেলওয়ে, মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, টেলিগ্রাম প্রভৃতি বিদ্যা বিস্তারের উপাদান প্রাপ্ত হইয়া এখন আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা বুঝিয়া আমাদের নিজের কর্ত্তব্য অবধারণ করা একান্ত আবশ্যক। এই পুস্তকখানি সেই কর্ত্তব্য অবধারণে সহায়তা করিবে, এই উদ্দেশ্যেই লিখিত।

এই সুবৃহৎ গ্রন্থের মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র।

লওয়া অপরিহার্য্য। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকার উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য দেড় টাকা।

—:•:—

বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ)

এই গ্রন্থে এই তিন খানি সংস্কৃত নাটকের—উত্তর চরিত, মৃচ্ছকটিক ও রত্নাবলীর—সুন্দর সমালোচনা আছে। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যালোচনা—Literary criticism এর চূড়ান্ত নিদর্শন। সংস্কৃত-সাহিত্যের তিনখানি শ্রেষ্ঠ নাটকের সৌন্দর্য্য কোথায়, তাহার সুনিপুণ বিশ্লেষণ দেখিয়া কাব্য সৌন্দর্য্য নূতন করিয়া অনুভব করিবেন। নাটকীয় চরিত্রগুলি কিরূপভাবে বিশ্লেষিত হইলে নাটকের রস উপভোগে সহায়তা করে—স্বর্গীয় ভূদেববাবু তাহা প্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন। সাহিত্যসেবী-গণের এই পুস্তক পরম আদরের ধন।

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকার, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য এক টাকা।

বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ)

মনুষ্যসৃষ্টি, মানবজাতির সহিত দেবতার সম্পর্ক, ভাষার পর্য্যায়ক্রম, লিপির পর্য্যায়ক্রম, বাঙ্গালী সমাজ, বঙ্গ সমাজে অন্তঃশাসন, বাঙ্গালীর উত্তম-হীনতা, অধিকারীভেদ ও স্বদেশানুরাগ, সন্তানোৎপত্তি, তন্ত্রশাস্ত্র, তন্ত্রের যাবতীয় কথা এবং সাধন প্রকরণ, যুদ্ধ প্রণালী, স্বাধীন বাণিজ্য, শান্তি ও সুখ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ৭১ টি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি পাণ্ডিত্যে ঝলমল করিতেছে—অথচ এমনি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষাতে লেখা যে কোথাও বুঝিতে কষ্ট হইবে না। অশিক্ষিত পাঠকও এই বিবিধ প্রবন্ধের রস সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায়

উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। প্রবন্ধ গৌরবে অতুল গ্রন্থ। মূল্য এক টাকা।

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস

ভারতের উন্নতির প্রকৃত ঐতিহাসিক পথ কি তাহা এই পুস্তকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কল্পনার সহিত স্বদেশ-প্রেমের এমন মিল বাঙ্গলার আর কাহারও কোন রচনায় মিলিবে না। প্রতিভার এ এক অপরূপ কীর্ত্তি!

"৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে যে আলোচনা এবং চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই অসাধারণ মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের অনুরূপ। সেই আলোচনা ও চিন্তার ফল "স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস।" এই পুস্তকখানি তিনি নিদ্রিত অবস্থায় লিখিয়াছিলেন। তিনি নিজে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, পড়িয়া দেখুন :—

"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে উঠিয়া দেখি, কয়েক খণ্ড কাগজ আমার শিরোদেশে রহিয়াছে। তাহার লেখা দেখিয়া কখন বোধ হয় আমার নিজের হাতের লেখা হইবে, কখন বোধ হয় আমার না হইতেও পারে। নিদ্রাবস্থাতেও যে কেহ কেহ কখন জাগ্রতের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহার অনেক উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। যাহা হউক, শাস্ত্রে বলে স্বপ্নলব্ধ ঔষধ এবং উপদেশ কদাপি অগ্রাহ্য নহে। শাস্ত্রানুবর্ত্তী কার্য্য করাই উচিত বোধে এই "স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস" প্রচার করিতে দিলাম।

"পাঠক পাণিপথ যুদ্ধে যদি মহারাষ্ট্রীয়দিগের জয় হইত, হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ যদি তিরোহিত হইত, মহারাষ্ট্র-সম্রাট যদি বাহা বাহা

বিদ্বান্ বিজ্ঞ হিন্দু-মুসলমান মন্ত্রী লইয়া সাম্রাজ্য চালাইতেন, ভারতের আর যত রাজ্য যদি এই ব্যবস্থায় অনুমোদন ও সাহায্য করিতেন; ভারতের যদি এইরূপে একতা বন্ধন হইত, এবং একতা-বন্ধনে যদি বল বৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে কি পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থায়ই ভারতের হইতে পারিত না? আভ্যন্তরিক বিবাদ বিসম্বাদই দুর্ব্বলতার হেতু। মুখোপাধ্যায় মহাশয় মানব চক্ষে ভারতের ভাগ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ভারত কি হইতে পারিত, কি হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। ভারতের স্বপ্নলব্ধ ইতিহাস পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। পুস্তকখানির নমুনা স্বরূপ কয়েকটি স্থান মাত্র উদ্ধৃত করা হইল।"
—দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা। মূল্য আট আনা মাত্র।

ঐতিহাসিক উপন্যাস

বাঙ্গলা ভাষায় এই পুস্তক খানি সর্ব্ব প্রথম উপন্যাস। ইহার ভাষা ও ভাবের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের একটা অধ্যায়ও আয়ত্ত হইয়া যায়। ইহা বালক-বালিকাদিগকেও নিঃসঙ্কোচে পড়িতে দেওয়া যায়। ইহার 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক গল্পটী পড়িয়া দেখুন, কিরূপ পবিত্র ও মনোহর। ইহাতে দুইটী স্বতন্ত্র উপন্যাস দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালার প্রথম ও বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া ইহার আদরও যথেষ্ট।

আজকালকার উপন্যাস পাঠক ও পাঠিকাবৃন্দ 'দাদা-মহাশয়ের যুগের' এই উপন্যাসে যথেষ্ট রস, উদ্দীপনা, কৌতুক ও আমোদ উপভোগ করিবেন এবং তৎসঙ্গে স্বদেশহিতৈষিতাও লাভ করিবেন। মূল্য আট আনা।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

পরিবর্ত্তের জোরে (উপন্যাস) — ৩৲

ছায়াপো [illegible] (উপন্যাস) অতুলনীয় গ্রন্থ, আধুনিক যুগের উপযোগী (বাঁধান) — ২॥০

জোয়ার ভাঁটা (উপন্যাস) দেশী বিলাতীর অপূর্ব্ব সম্মেলন (বাঁধান) — ১॥০

শিশু মঙ্গল (প্রবন্ধ) — ৵০

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

মেয়ের বাপ (উপন্যাস) হিন্দু পরিবারের করুণ চিত্র (বাঁধান) — ১॥০

কণ্ঠহারা (উপন্যাস) ব্যর্থ প্রেমের গোপন চিত্র (বাঁধান) — ১॥০

৺ইন্দিরা দেবী

শেষদান (গল্পের পুস্তক) লেখিকার শেষ পুস্তক (বাঁধান) — ১॥০

রায় বাহাদুর পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

কুমারী তরুদত্তের জীবনী বিদুষী বঙ্গবালার অপূর্ব্ব কাহিনী — ।৵০

কুমারী দ' আরভরসের দৈনিক আলেখ্য (উপন্যাস) কুমারী তরুদত্তের ফরাসী উপন্যাস "মাদমোয়াজেল দি আরভরসের" বঙ্গানুবাদ (বাঁধান) — ২৲

কৃতকৃত্যতা (Laws of Success) উন্নতির উপায়, নূতন ধরণের পুস্তক (বাঁধান) — ৫৲

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাল

সতীর পতি, আলেয়ার আলো (দুইখানি উপন্যাস) (বাঁধান) — ১৲

[illegible] (প্রবন্ধ) — ৶৩

[illegible]